মায়ামৃগ

(প্রেম-কাব্য)

সুভো ঠাকুর

দি বুক এম্পোরিঅম লিমিটেড

কলিকাতা ৬

প্রকাশক
প্রসাদকুমার সিংহ
দি বুক এম্পোরিঅম লিমিটেড
২২-১, কর্নওঅলিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬
মুদ্রাকর
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী
পরিচয় প্রেস
৮বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা ৬
চৈত্র ১৩৫৫
চার টাকা

ছায়া-চিত্র-শিল্পী শ্রীমতী সুপ্রভা দেবী এবং শ্রীযুক্ত শম্ভু বসুকে-

'মায়ামৃগে'র বংশ পরিচয় ও জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে কয়েকটি কথা

শুনেছি, মধুসূদন দত্ত মিলটনের কাছ থেকে মেরে অমৃতাক্ষর ছন্দ আমাদের এদেশে এনে চল্‌তি করে দিলেন···কিন্তু অপেরা বলে কোনো বস্তু বাংলা সাহিত্যে কিছুদিন আগে অবধি যতদূর মনে হয় ছিল না—আমাদের দেশে পালা-গান থাকতে পারে, গীতি-বহুল যাত্রাও থাকতে পারে, এমন কি হয়তো গীতি-নাট্যও ছিল, কিন্তু নিছক এই পরদেশী প্রথার অপেরা (অপেরা বলতে কি বোঝায়, যাঁরা বিলিতি অপেরা পড়েছেন কিম্বা দেখেছেন, তাঁরাই ঠিক বুঝবেন) রবীন্দ্রনাথের আগে বোধ হয় কেউই লিখতে প্রয়াস করেন নি। এখানে এই 'বোধ হয়' শব্দটি ব্যবহারের একটা হেতু আছে, সেটা আর কিছু নয়—বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এবং তার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার আকাট অজ্ঞতা বশতই এই 'বোধ হয়' শব্দের আমদানি! আমি, মহাত্মা নির্দ্দেশিত অহিংসা-নীতির একজন খাঁটি সেবাইয়াৎ। তাই, সন-তারিখের মারামারিময় ইতিহাসের রণরঙ্গিনী রাজ-সড়ক সর্ব্বদা সযতনে এড়িয়ে, আন্দাজের অলিগলিতেই ঘুরপাক খেতে খেতেই বর্দ্ধিত হয়েছি। এই আন্দাজের মাথায় চলাফেরা করতে করতেই ঐ আন্দাজ আমার মধ্যে অনেকটা পাশবিক ইন্‌স্‌টিঙ্কট্‌-এর মতই দাঁড়িয়ে গেছে। সেইজন্যে আন্দাজ মাফিক যে-বাণী আমার ঝর্ণা-কলমে নির্ঝরিত হয়—ফুকের মাথায় ফলেও যায় তা দেখেছি বহুবার।

যাই হোক, কথা হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা অপেরা নিয়ে—তাঁর আগের যুগের লেখা 'বাল্মীকি প্রতিভা' 'কালমৃগয়া' 'মায়ার খেলা' 'ফাল্গুনী' ইত্যাদিকেই আমি পূর্ণাঙ্গ অপেরার প্রচেষ্টা রূপ ধরব, কারণ পরবর্ত্তী যুগের তাঁর যে সব লেখা :— 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গ-শালা' 'চণ্ডালিকা' 'চিত্রাঙ্গদা' ইত্যাদি যে সব পুস্তকগুলি, ইদানীং গীতিনৃত্যবহুল নব নব ঢংয়ে রঙ্গ মঞ্চে রূপ পেয়েছিল—সেগুলিকে আমার মনে হয় পূর্ণাঙ্গ অপেরার চেয়ে ডান্স এবং মিউজিক্যাল-এক্‌স্‌ট্রাভেগেঞ্জা হিসেবে ধরলেই ভাল হয়। অন্তত পক্ষে আমার তো তাই মনে হয়েছিল। এর পর যদি কেউ 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গ-শালা' 'চণ্ডালিকা' ইত্যাদিকে অপেরা বললে আপ্যাইত হন, আমার তাতেও কোনো আপত্তি নেই—কারণ আমি মূর্খ হতে পারি, কিন্তু সাহিত্য-সমালোচক নই।

রবীন্দ্র-উত্তর-যুগের সাহিত্য সম্পর্কে আমার সবিশেষ জ্ঞান না-থাকলেও আমার ধারণায় আমি ছাড়া কেউ পূর্ণাঙ্গ অপেরা রবীন্দ্রনাথের পর লিখতে প্রচেষ্টা করেছেন কিম্বা কৃতকার্য্যতার সঙ্গে লিখেছেন এমন কথা জানা নেই—সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী যুগে এই 'মায়া-মৃগই' একমাত্র অপেরা যা উল্লেখযোগ্য—তবে এক একবার

মায়ামৃগ

মালুম মারে, যে এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আধুনিক জীবনের কোনো সুনামধন্য নৈশ-ক্লাবের জীবন যাত্রা কিম্বা তথাকথিত চোখ-কপালে-তোলা সমাজের হাসি-তামাসা প্রেম-বিরহ জল-কেলি (বেদিং বিউটি) তার সঙ্গে আবার রাজনীতির রক্ত-চক্ষুর অপাঙ্গ ইসারাময় 'জয় হিন্দ' অবধি এমনিতর অর্ডারি জগা-খিচুড়িকে পাকা-পোক্ত-পাচকের ন্যায় উপভোগ্য করে পাতে পরিবেশন করতে পারতেন কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অপেরাগুলির কোনো বালাই নেই—সেগুলির সবগুলিই ত—রূপক, নয় ফ্যানটাসিয়া, নয় তো, পৌরাণিক পরিবেশ তাদের পরিধানে। অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে—উপরোক্ত আমার-ধরণের অভূতপূর্ব্ব জগাখিচুড়ি লেখায় তাঁর অক্ষমতার যে ইঙ্গিতটুকু আমি করেছি—তা নিছক আমার আন্দাজ! সেই হিসেবে এই ব্যাপার নিয়ে তর্কের-তরঙ্গ চায়ের পেয়ালায় না উঠালেই আনন্দিত হব।

আদতে 'মায়ামৃগ' লিখতে আমি শুরু করেছিলাম যখন, তখন নিছক মেজাজ-ই ছিল আমার একমাত্র মূলধন। আপন খুশীতে শুরু হয়েছিল লেখা ··এমন সময় হটাৎ একদিন রাসবিহারী য়্যাভেনিউ দিয়ে চলেছি পায়দল-গাড়িতে—আর তাঁরা বসে, বিরাট বিপুল এক দানবীয় মোটরের দারুণ একখানা সামনের আসনে, আর আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন আমার দিকে···

সেদিন অবধি অতো গুলো বছর, চিরকালই তো পায়-হাঁটা-পাওনাদারই নয়তো পায়-হাঁটা কোর্টের পিওন—এরাই তো আমার পেছু নিয়েছে এবং তাদের পাশ কাটিয়ে চলার চাল, তাদের মুঠি থেকে ফস্কে-পালাবার ফাঁক, এগুলো আমি চক্ষের-পলকে এতো স্বাভাবিক সহজভাবে ঘটিয়ে ফেলি যে এ-ঘটনাগুলো—খাওয়া-দাওয়া-নাওয়ার মতই নতুনত্ববিহীন নিত্তনৈমিত্তিক অতি-সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার জীবনে। কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমি ভড়কালুম!—বিরাট গাড়িতে চড়ে পেছু নিয়েছে—এ আবার কি রকম ধরণের পাওনাদার! আর পাওনাদার যদি মোটরে চোড়ে তাড়া কোরে বেড়ায়, তবেই তো গেছি—একটা নতুন বিভীষিকায় ধড়াস-ধড়াস করে উঠলো বুক। বড় রাস্তা ছেড়ে—বাঁয়ে ল্যান্সডাওন রোডে, তারপর আবার বাঁয়ে যতীন দাস রোডে বেঁকে সটকান দেব ভাবছি, এমন সময় হটাৎ এক অবাক কাণ্ড—এঁরা পাওনাদার নন্! কন্তেভার্দে জাহাজে সহযাত্রি ছিলেন—এঁরা সে-যুগের শ্রদ্ধাস্পদ য়্যাসেম্বলির ভাইস প্রেসিডেণ্ট অখিল দত্ত মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র নেপাল এবং মৃণাল দত্ত। কিন্তু আদৎ-এ এঁদের আমার পিছনে তাড়া করার সঠিক কারণ তখনও আমার অজ্ঞাত। আমি তো তাঁদের পাইওনিয়ার ব্যাঙ্কের মক্কেল হবার উপযুক্ত নই—কারণ আমার মত মক্কেল হলে ব্যাংকের আক্কেল-সেলামি ছাড়া সে-ব্যাঙ্কের বরাতে আর সব কিছুই নির্ঘাৎ বরবাদ ঘটবে, এতো সর্ব্বজন বিদিত। য়্যাকাউণ্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গে কতখানি ওভার-ড্রাফ্ট্ পাব, তার আগাম পাকাপাকি আশ্বাস না পেলে আমি জীবনে ডার্টি ক্যাপিটালিস্টদের মত ব্যাঙ্ক-য়্যাকাউণ্টের ধারে কাছেও কখোনো ঘেঁসিনি। তবে কি তাঁদের বাণিজ্য ব্যাপারের কোনো আবশ্যক? কিন্তু আমার বাণিজ্য সম্পর্কে পরামর্শ যে-কেউ নেবে, তার লালবাতি জ্বালানোর সময় হয়ে এসেছে বুঝতে হবে। তাই জন্যে, কি দরকারে তাঁরা আমার পাওনাদার না-হয়েও আমার পেছু ধাওয়া করেছেন, এ-বিষয় জানার একটা অহেতুক কৌতুহলে আমিও তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছি। এমন সময় একেবারে গায়-এর উপরে গাড়িটা এসে থেমে গেছে তখন—এবং নেপাল বাবু গাড়ির দরজা খুলে তাঁর পাশে ভিতরে উঠতে ইঙ্গিত করলেন—আমি ধন্য হলেম। বহুদিন বড় গাড়ির নরম কুশানে এলিয়ে বসা হয় নি, তাই সেদিন আরামে চোখটা বুঁজে এলো। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর আবার এনার্জ্জি জড় করে সটান হয়ে বসে বললুম—"কি নেপাল বাবু? দেখা-সাক্ষাৎ নেই বটে কিন্তু লোক মুখে শুনি, বেজায় বড় লোক হয়েছেন! তা আমার আঁকা ছবিটবি কিছু কিনুন।"

মায়ামৃগ

—ছবি তো কিনবো, কিন্তু তার আগে আমরা যে একটা ছবি তুলছি—তাতে আপনার সাহায্য চাই।

—তোফা, আমি একটা সিনেমার জন্যেই বই লিখতে শুরু করেছি—অপেরা! এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যা কেউ করেনি—এই রকম নতুন ধরনের একটা জিনিষ করুন, যা আপনাদের সুনাম সুখ্যাতি এবং পাইওনিয়ার হওয়ার প্রাইড্—সব কিছুই সরবরাহ করবে।

—কোথায় সে বইটা? শোনান না আমাদের একবার।

'মায়ামৃগের' মাত্র দুটো দৃশ্য তখন লেখা হয়েছিল। এই দুটো দৃশ্য শোনাতেই তাঁরা খোশ-মেজাজে তাঁদের ভাবী ডিরেকটার শ্রীদেবকী বোসের কাছে নিয়ে গেলেন এবং নানা আলোচনার পর এই বইটি নেওয়া হোলো বলে স্থির হোলো—এবং যত শীঘ্র পারা যায়, একে শেষ-করার সুরু হোলো তাগিদ—সেই মুহূর্ত্ত থেকেই। তবে, সত্যি কথা বলতে কি—আমার মনে হয়েছিল, এমনিতর নতুনতম জিনিষটিকে দেবকী বাবু যে খুব সুনজরে নজর করেছিলেন তা আমার বোধ হয় নি—তাঁর 'রামলীলা' 'কৃষ্ণলীলা' নয় তো 'স্যার শঙ্করনাথের' মত বই—যার লেখা থেকে ডাইলগ্ অবধি সব তাঁর নিজের—ঐ-রকম জিনিষের প্রতিই তাঁর অনুরাগ ছিল বেশি। তাই নেপাল বাবু এবং মৃণালবাবুর সঙ্গে আলোচনার সূত্রে আমার এই বইয়ের চেয়ে ইঙ্গিত করলেন—তাঁর বাসনা, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' কিম্বা 'চন্দ্রশেখর' করায়। এতে মনে করবেন না কেউ যে দেবকী বাবুর এই ব্যাপারে অর্থাৎ তাঁর এইরূপ বাসনায়, হয়েছে আমার অসীম আপশোষ! কারণ ফিল্ম-লাইনের ব্যাপারি-বৃত্তি আমায় কখনোই আকর্ষণ করেনি। বহু সাহিত্যিক ফিল্ম ল্যাণ্ডএ শেষ অবধি আস্তানা আকড়ানোয়—জমি-বাড়ি-গাড়ি পদ-মর্যাদা অনেক কিছুই করেছেন। কাঁচি সিগরেট যাঁদের কদাচিৎ জুটতো, তাঁরাই বায়স্কোপের ব্যবসায় নেমে দেখি—পাঁচশ পঞ্চান্নর টিন এক হাতে, আর পঞ্চাশ ইঞ্চি ধুতির কোঁচা আর এক হাতে না-কোরে মোটেই নড়তে চান না। কিন্তু আমার কি জানি কেন এই সিনেমা লাইন—একটা নতুন অভিজ্ঞতা হিসেবে আকর্ষণীয় হলেও ঐ নিয়ে সেঁটে-থাকার বাসনা মনে কখোনো উদয় হয়নি। তার প্রথম এবং প্রধান কারণ লোকে বলে—আমি অনন্য সাধারণ, যাকে আর কি সোজা চলতি ভাষায় বলে অ-সাধারণ। আমার চলা-ফেরা, কথাবার্ত্তা, লেখা-ছবি-আঁকা সবই নাকি সাধারণের চিন্তায় অস্বাভাবিক, অদ্ভুত! সত্যিই, অস্বাভাবিক অদ্ভুত কিছু না হোলে—সে সিনেমাই হোক, আর ছবি আঁকাই হোক, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। তবে এই 'মায়া-মৃগ' সূত্রে সিনেমা-রাজ্যে উঁকি মারার কারণ হয়েছিল—এই লেখাটার নতুন ভঙ্গি এবং ফুল-ফ্লেজড্ অপেরা ভারতবর্ষের সিনেমা-ওয়ার্লডে কেউই য়্যাটেম্প্ট করেনি ইতিপূর্ব্বে।

এর পরে শ্রদ্ধেয় দেবকী বসু এবং বন্ধুবর নেপাল ও মৃণাল দত্ত যে কোন কারণেই হোক, শেষ অবধি এই 'মায়ামৃগকে' বাতিল কোরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরকে' সাধারণের উপযোগী কোরে পুনঃ রচনার পর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং অর্থব্যয়ে প্রযোজনা কোরেছিলেন। সে-'চন্দ্রশেখর' কি অপূর্ব্ব হয়েছিল—জন-সাধারণের

মায়ামৃগ

অনেকেই তা দেখেছেন আশা করি। যাই হোক, বন্ধুবর নেপাল এবং মৃণাল দত্ত আমার এই বইটি সিনেমার জন্যে নিন আর না-নিন, আদৎ-এ তাঁদের দুজনের তাগিদের তরঙ্গ সামলাতে গিয়েই শেষ অবধি শেষ হয় বইটি। সে জন্যে আজ ভূমিকা লেখার সময় তাঁদের কাছে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—তাঁরা তাঁদের অধুনা-বন্ধ-হয়ে-যাওয়া পাইওনিয়ার ব্যাঙ্কের হেড আফিসের একটি নিভৃত কক্ষে আমায় বসিয়ে খাতা-কলম আর ব্রাহ্মণ-ভোজনের ও নগদ দক্ষিণায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবস্থা না করলে, এই 'মায়ামৃগ' বইটি—যা একদা মেজাজের মাথায় সুরু হয়েছিল—তা আবার একদিন মেজাজের মাথাতেই অর্দ্ধ সমাপ্ত রেখে অন্য কাজে উদব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তাম।...

মাসিক বসুমতীর সুযোগ্য কর্ণাধার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক এই 'মায়ামৃগের' প্রথম দুতিন পরিচ্ছেদ চিত্র-সহ মাসিক বসুমতীতে ছেপে এবং সেই সমস্ত ছবিগুলি ব্লকসহ এই বইটিতে ছাপাবার অনুমতি দিয়ে তাঁর কাছে এবং বসুমতীর কাছে যে অশেষ ঋণী করে রাখলেন—সেকথা সানন্দে এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেই ক্ষান্ত দিলেম, কারণ সুভো ঠাকুরের ঋণ-পরিশোধের অন্য কোন পন্থা নেই বলেই সবাই জানে।

এ বইটি লেখা প্রায় বছর তিনেক আগে, তখনকার দিনের সমসাময়িক রাজনৈতিক আবহাওয়ার অল্প আঁচ যা এ-বইটিতে আছে, তা আজ চল্‌তি না থাকলেও আমার মতে—পাঠকদের কাছে তা বিলকুল অস্বাভাবিক বলে বোধ হবে না।

এবার শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করছি আজকার দিনে সুদুর্লভ সেই খাদ-হীন সুবর্ণ-সমান আদমিটিকে—যাঁর নাম বীরেন ঘোষ, যিনি বুক এম্পোরিয়াম পরিত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এই বইটিকে বুক এম্পোরিয়ামের তরফ থেকে প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়ে আমার প্রাপ্য দক্ষিণা চুকিয়ে দেন। এর পর পাবলিসার—দি বুক এম্পোরিয়াম লিমিটেড-এর কর্ত্তৃপক্ষ তরফের ইচ্ছা অনুযায়ী এর আখ্যা শেষ অবধি রাখা হোলো 'প্রেম-কাব্য'—যদিও আমি বলব, অপেরা বলে চালালেই বা কি এমন ক্ষতি হোতো? পাবলিশারের যুক্তি হচ্ছে—বাংলা দেশের বিয়ের বাজারে যাঁরা কবিতার বই (রবীন্দ্রনাথ ছাড়া) উপহার দেন,—তাঁদের মধ্যে যাঁরা উপহার দাতা এবং যাঁরা উপহার গ্রহীতা এই দুপক্ষই কেউই নাকি 'অপেরা' বেড়াল-ছানা কি ছাগল-ছানা তা সঠিক তাঁরা বলতে পারবেন না, তাই 'প্রেম-কাব্য' বললে, যদি বিয়ের বাজারে উপহারের বই হিসেবে দুচার খানা বিক্রি হয় তাই ঐ রকম গুরুগম্ভীর বিশেষণের গুরুভার লেজুড়ের মত জুড়ে দেওয়া।

সর্ব্ব শেষে উপসংহারে এইটুকু বলে শেষ করতে চাই, যে, করিৎ-কর্ম্মা পুরুষসিংহ প্রসাদ সিংহ না থাকলে, ছাপা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েও এবং এই তিনবছর বাদেও এই বই বেরোতো কিনা সন্দেহ—কারণ একমাত্র সুভো ঠাকুরের কবিতার বাজার দর থাকলেও—তবুতো কবিতার বই! তার উপর এই বইয়ের বাজারের দারুন অবনতি—সকলেই বলে, কি হবে বই ছেপে? বিক্রি তো হবে না একখানাও। তবু প্রসাদ সিংহ সকলের সব মত অগ্রাহ্য করে বের করলো এ বইটা—একমাত্র এর অদ্ভুত নতুনত্বের আকর্ষণেই। ও' নিছক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে এই ব্যাপারে, তাই বুদ্ধিমান লোককে ধন্যবাদ দিয়ে অহেতুক নির্বোধ বানাবার বাসনা হতে বিরত হলেম।

সুভো ঠাকুর

সতেরই মার্চ্চ, উনিশ্‌শ আটচল্লিশ
কোলকাতা

এতে যারা আছে—

টুটুল	বাব্লি
সঞ্জীব	মায়া দেবী
বকু বোস	বীণা রায়
রাজীব সোম	এলা গুপ্তা
ভুলু ঘোষ	লিলি
প্রশান্ত সিংহ	বেলা
সঞ্জয়	মিলি
মণ্টু রায়	শিলা
বাব্লির বাবা	নিতা
রণজিৎ রায়	ঊষা
প্রতাপ	ইলা
অজয়	বাব্লির মা
বেয়ারা	অজানা দেবী
খানসামা	আয়া
সোফার	বিবিজান

বয়, মেঠাইওয়ালা, ম্যাগনোলিয়াওয়ালা, চানাচুরওয়ালা, দইবড়াওয়ালা, ঘুঘনিওয়ালা।

আদি পর্ব্ব

(টুটুলের ডাইনিং রুমের দৃশ্য—

ডাইনিং টেব্‌ল এক পাশে, আরেকপাশে কয়েকটা কৌচ আর তার মাঝখানে সেণ্টার টেব্‌ল দিয়ে বেশ একটা 'কোজি কর্ণার' বানানো হয়েছে।

টুটুলের ডিনার খাওয়ার শেষপ্রান্তে ও'র বন্ধু সঞ্জীব এসে হাজির। খান্‌সামাকে কফির হুকুম করে টুটুল 'ন্যাপ্‌কিন্‌টা' কোলের থেকে উঠিয়ে টেব্‌লের একপাশে রেখে দিল। তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে কফি টেব্‌লের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সঞ্জীবের উদ্দেশ্যে বল্‌লে—)

টুটুল—কফিতে আপত্তি নেই নিশ্চয়-ই ?

(হুটো কৌচে প্রায় মুখোমুখী হয়ে টুটুল আর সঞ্জীব বস্‌লো। তারপর সঞ্জীব গম্ভীর গলায় মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে বল্‌লে।)

সঞ্জীব—তা তো নেই, কিন্তু বাব্‌লির সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে !—

(বয় কফির সরঞ্জাম রেখে যাওয়ার পর টুটুল সঞ্জীবের পেয়ালায় কফি ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে)

টুটুল—তাই নাকি ?

সঞ্জীব—তাই নয়, তার চেয়ে একটু বেশী।

(এবার টুটুল সঞ্জীবের মুখের দিকে চেয়ে)...

টুটুল—তার মানে ?

সঞ্জীব—তার মানে ভেবে দেখ নিজে।

টুটুল—কি ভাববো ?

সঞ্জীব—তাতো বটে, ভাব্‌বে আর কি ? বাব্‌লি ঠিকই বলেছে।

টুটুল—তার মানে কি বলেছে ?

সঞ্জীব—বলেছে, তুমি ও'কে ঠকিয়েছ। শুধু তাই নয়, তোমার হৃদয়ের রাজত্বে হানা দেওয়ায় ও'কে ঠেকিয়েছ—ও'কে নিষ্ঠুরভাবে এড়িয়ে চলে।

টুটুল—চমৎকার। নাট্যমন্দির থেকে সবে ফির্‌ছো নাকি ?

সঞ্জীব—ঠাট্টা নয় টুটুল, ও' বলে তোমার জন্যে ও' নাকি জান্ কবুল করেছে—তবু তোমার মনের কবুলতি পাট্টাখানা মুঠোর মধ্যে পেলো না আজ তক্।

টুটুল—সুভো ঠাকুরী ভাষা—আরো চমৎকার।

সঞ্জীব—সিরিয়াস্‌লি, ও'কে বিয়ে কর্‌তে তোমার আপত্তিটা কি ?

টুটুল—ছ্যাখো সঞ্জীব, লোহার ঘুরে ঘুরে যাওয়া মেথরের সিঁড়ির মতো যারা শাড়ী পরে, বিশেষ দরকারে সেই সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা সার্‌তে হয় কিন্তু জীবন-সঙ্গিনীর সদর দরজার সান-বাঁধানো সোপান সেটা নয়।

সঞ্জীব—টুটুল, তোমার ইঙ্গিত ভদ্রতার সঙ্গে ভাদ্দরবৌয়ের সম্পর্ক পাতাতে চাইছে যেন···

(টুটুল জোড়হাত করে)

টুটুল—আচ্ছা, ব্রাহ্মমতে মার্জ্জনা যাচ্ঞা করছি। সুভো ঠাকুরী ভাষায় 'মাফী' মাঙ্‌ছি। সত্যিই বলছি, ওই লিপষ্টিকে-লাল হাই-হিল্-ওয়ালারা সময় সঁাটাবার জন্যে তোফা। ও'দের কানের ঝাড়লণ্ঠন, বুকের পিনিয়ান মার্কা পেনডেণ্ট, সবই ভাল, কিন্তু টোকা মার্‌লে দেখা যায় ঠন্‌ঠনে ঠুন্‌কো। ভঁাড়ে মা ভবানী। গভীরতার গন্ধটুকুও তাতে নেই।

সঞ্জীব—শুনি, তোমার গভীরতায় গা-ভরা সে মেয়েটি কে এবং কোথায় ?

টুটুল—ইলা। দেশের জন্যে নিজের দেহটাকে ক্ষইয়েছে সে, ইচ্ছে করলে সে-ই কারুর জন্যে মনটাকেও খোয়াতে পারে।

সঞ্জীব—ইলা যে স্বদেশী ব্যাপারে ছু'বার জেলে গেছে—তুমি কি পাগল? তোমার বাবা একজন বনেদী বড়লোক, তুমি যুদ্ধের কালোবাজারে রোজগার কর্লে দিস্তে দিস্তে সাদা নোটের তাড়া,—শেষকালে কিনা তোমার মুখে ইলা!

টুটুল—ভূতের মুখে রামনাম, কি বল? ভুলে যাচ্ছ কেন, কালোবাজারের অভিজ্ঞতাতেই তো সাদা লোক চিনতে শিখেছি ঠিক মতো।

সঞ্জীব—তাইত দেখছি। গান গেয়ে আর কাব্য চর্চ্চার 'হবিতে' তোমার মগজটা হাবুডুবু খাচ্ছে। তোমার কথা ধর্ত্তব্য নয়—বাব্লী তোমার পদমর্য্যাদা অনুযায়ী সামাজিক স্তরে সমান সমান। ও'কে অমন অবহেলা করলে নিজেই পস্তাবে।

(শিস্ মেরে টুটুল গান গাইতে গাইতে কফির পেয়ালায় চুমুক মার্লে)

—টুটুলের গান—

যদি পিছিয়ে পড়ি
যদি পড়ি হুমড়ি খেয়ে,
তখন সখা দয়া করে
দাঁড়িও ক্ষণেক চেয়ে···

সঞ্জীব—আঃ, কথায় কথায় তোমার শিস্ মেরে ওই গান আর সহ্য হয় না। একটা সিরিয়স্ কিছু কথা বল্লেই তুমি গান গেয়ে তা' উড়িয়ে দিতে চাও। কি কুক্ষণে তোমার ঐ গানের 'হবি' হয়েছিল?

টুটুল—গান আমার 'হবি' নয়—প্রাণ।

সঞ্জীব—আমি উঠ্‌লুম।

টুটুল—না, না, যেও না বন্ধু।

(রেগে সঞ্জীব সরে পড়লো।)

—টুটুলের গান—

যায় যায়গো যায়
সবাই চলে যায়—
খালি, তোমার লাগি দরজা ধরে
দাঁড়িয়ে আমি ঠায়।
ও ধনি মোর পরশমণি।
আমার মনের সোনার খনি,
তোমার সোনায় গয়না গড়ে
পর্‌বো কবে গায়,
আমি, দাঁড়িয়ে আছি তাহারই আশায়।

(গান গাইতে গাইতে টুটুল উঠে দাঁড়িয়ে আলিস্যি ভেঙে নিজের মনেই বল্লে—)

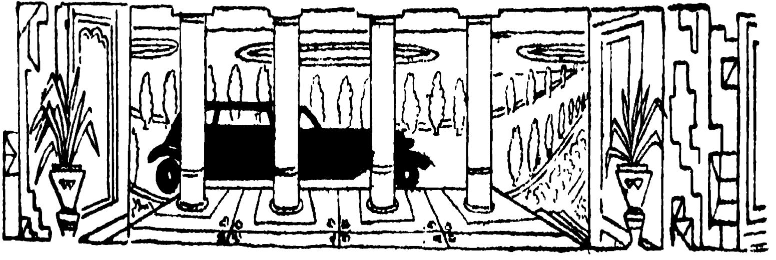
টুটুল—রাত হয়েছে ঘুমোতে যাই।

(টুটুল বেড রুমের দিকে এগুলো।)

টুটুলের বেড্‌রুমের দৃশ্য

টুটুল বিছানায় ঘুমোচ্ছে

গভীর নিদ্রার মধ্যে ও'র বোঁজা চোখে স্বপ্নের সোনালী-
পর্দার ঝিলিমিলি নেমে এসেছে তখন।



টুটুলের স্বপ্নলোক

(সময় শীতের দেরী-হওয়া-সকাল—

বালীগঞ্জের বুকে অনেকখানি বাগান নিয়ে আধুনিক কায়দার ছিম্‌ছাম্‌ সুন্দর একখানি বাড়ি। বাগানের দুই প্রান্তে দুটি লোহার ফটক, মোটরগুলো যাতে এক দিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে সেই জন্যে করা। ফটক দুটির পাশে খাড়া হওয়া থামগুলো ফুল সমেত লতার ভারে প্রায় চাপা পড়ার দাখিল।

বাড়ির হাঁ-করে-থাকা মুখবিবরের মত বিরাট গাড়ীবারান্দা, যার দাঁতের মত ঘর-কাটা-কাটা ফাঁকে নানা রকম ফার্ন গাছ, কোথাও পিতলের কোথাও বা চীনেমাটির টবে সাজানো। সেই গাড়ীবারান্দা থেকে চার-পাঁচটা সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে লম্বা এপার-ওপার টানা বারান্দা। একটা প্রকাণ্ড গ্রেট ডেন্‌ শিকলি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় গাড়ীবারান্দাটার রকে শুয়ে আছে। এমন সময় একটা লম্বা সরু স্পোর্টস্‌ গাড়ী গেটের কাছে এসে ইলেকট্রিক হর্ণ দিতেই মালী গেটটা খুলে দিল। গাড়ীটা হুস্‌ করে কাঁকর-বেছানো ঘোরানো পথটা মুহূর্তে পেরিয়ে হাজির হল ঠিক গাড়ীবারান্দার তলায়। ঘুরে গেটের কাছে গাড়ীটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরটাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তার পর গাড়ীটা সামনে হাজির হওয়া মাত্র লাফিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে সুরু করলো, তাতে ভিতরের ঘরে ঝাড়পোঁছে ব্যস্ত ঝাড়ন হাতে একটি বেয়েরা বেরিয়ে এসে গাড়ীর দরজা খুলে আরোহিণীকে সেলাম দিল।

হাল্কা আস্‌মানী রঙের শাড়ীপরা—সকাল বেলার বাহুল্য বর্জ্জিত সাদাসিদে আল্‌তো ভাবে সাজা আধুনিকা একটি মেয়ে। ঠোঁটে তার অস্পষ্ট লিপষ্টিকের একটু আভাস, সোলজারদের টুপিতে গোঁজা বেঁকানো

পালকের মত, একথোকা হাস্‌নাহেনার হেলানো মঞ্জরী খোঁপাতে বেঁকিয়ে গুঁজে রাখা—যা একটু বেরিয়ে ঝুলে আছে, যেন সবুজ রেশমের তৈরী একটি থোপ্‌না।

—মেয়েটির নাম বাব্‌লী।)



এক নম্বর দৃশ্য

(বেয়ারাকে উদ্দেশ করে)

বাব্‌লী। এই, তোর সাহেব কোথায় ওরে ?

বেয়ারা। ওঠেনি সাহেব, খায়নি এখনো চা।

বাব্‌লী। বলিস্‌ কি রে ? ঘুমিয়ে রয়েছে এত বেলা কোরে ?
জাগিয়ে দিবি তো যা—

(মেম্‌সাহেবের হুকুম অনুযায়ী সাহেবকে জাগিয়ে দিতে বেয়ারা প্রস্থানোদ্যত এমন সময় বাব্‌লী আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল)

বাবলী। না না থাক, দরকার নেই
বিকেলেতে ফের দেখা হবে সেই
ঘুম ভেঙে জানি উঠে আস্‌লেই
বিরক্ত হবে বা।

(বেয়ারা চলে যেতে যেতে ও'র কথায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে)

বেয়ারা। তা কি হয় মেম্‌সাব
হুকুম রয়েছে সে যে—
'আসে যদি কেউ খবর দেবার'

(পাশের বড় গ্রাণ্ডফাদার ক্লকটার দিকে চেয়ে)

গিয়েছে আট্‌টা বেজে।

(তারপর পাশের টেব্‌ল থেকে সকালের খবরের কাগজটা মেয়েটির সামনে বেতের টেব্‌লে রেখে বললে)

দিতেছি খবর এক্‌খুনি গিয়ে
কাগজটা একটু দেখুন না নিয়ে
চা টোষ্ট আমি যাচ্ছি যে দিয়ে

(ঝাড়নটা খুঁজতে খুঁজতে)

আঃ, ঝাড়নটা আবার
রাখল কোথায় কে যে ?

(এর পর বেয়ারা উপর দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। মেয়েটি তখন বেতের চেয়ার টেনে বসলে)

দু'নম্বর দৃশ্য

(দোতলায় টুটুলের শোবার ঘরের দৃশ্য—

অতি আধুনিক কায়দায় একটি খাট ও অন্যান্য শোবার ঘরের অনুযায়ী আধুনিক কায়দায় আসবাবপত্র। এক পাশে একটা দামী ড্রেসিং টেব্‌ল, তাতে নানা রকমের খুঁটিনাটি পুরুষোচিত প্রসাধনের জিনিষ।

পূবের একটা খোলা জানলা টপ্‌কে খাটে শুয়ে থাকা টুটুলের মুখে বেশ খানিকটা রোদ্দুরের ঝলক এসে পড়ায় টুটুল আলিস্যি ভেঙে এবার উঠে বসবে। তারপর নরম শোবার ঘরের চটিটা পায়ে গলিয়ে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে দিতে দিতে আস্তে আস্তে সেই খোলা জানলার ধারটিতে এসে হাজির হবে। তার পর নিজের মনে বলবে—)

টুটুল। বাঃ, রোদ্দুর মিষ্টি রোদ্দুর
চারি ধারে ঝল্‌মল্‌,
আলোয় আলোয় ভরপুর হয়ে
করে যেন টল্‌মল্‌।

(পরক্ষণেই টুটুল জানলার কাছ থেকে ড্রেসিং টেব্‌লের কাছে আসবে। তারপর ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রাসটা দিয়ে চুলটা ঠিক করতে করতে চেঁচিয়ে)





টুটুল। গরম পানি লে আও বেয়ারা
চাকরগুলো বিষম বেয়াড়া
হায়রান হনু দিতে গিয়ে তাড়া—
ইস্, উধাও ভৃত্যদল।

(খাস-কামরার খানসামা বেড টি'র ট্রে সমেত ঢুকবে)

টুটুল। কোথায় গেছিলি ? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে
ভেঙেছে আমার গলা
দেরী যদি হয় এবারে আবার,
দেব জোরে কানমলা।

খানসামা। মাফ্ করা হোক কসুর্ এবার,
হবে না দেরী যে আর।

টুটুল। সেভিং-এর পানি নিয়ায় তাহলে,
বকাস নে বারবার।

(খানসামা চলে যাবে। ড্রেসিং টেব্‌লের নীচু টুলটাকে চায়ের টেব্‌লের কাছে টেনে এনে টি-পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে টুটুল গুঞ্জরণ করবে।)

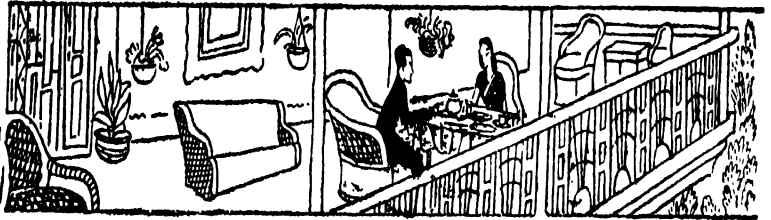
একাকী, একাকী—
কভু মিলিবে তোমার
দেখা কি ?
এখন থাকলে কাছেতে মেয়ে
হয়ত আমার পানেতে চেয়ে

গুন্ গুন্ গান গেয়ে
ঠোঁটেতে হাসির লেখা কি ?
চুড়িতে চুড়িতে টুং টাং কত
ভাঙা কুন্তল কপালে আনত
বিদ্যুতভরা অঙ্গুলি যত
খোঁপাখানি পিঠে মেলা কি ?
ঢেলে দিতে দিতে চা
হয়ত বলিতে বা
চায়ে চিনি আর দিতে হবে না
মিষ্টিতে মোরে চিনির চাইতে
কমতি লাগিছে না কি ?

(এমন সময় নীচের সেই বেয়ারাটি ঢুকলো। তারপর সেলাম দিয়ে)

বেয়ারা। মেমসাব এক হুজুরের সাথে
মোলাকাৎ আশে আসিয়াছে প্রাতে
বসবার ঘরে রহিয়াছে বোসে
এখনো অপেক্ষাতে।

টুটুল। উধার হাম্‌রা লে যাও খানা
উন্‌কা হাম্‌রা সেলাম দেয়ানা
'আতা হায় হাম আভ্‌ভি' ক'হানা
একসাথ খানা খাতে।



তিন নম্বর দৃশ্য

নীচের বারান্দায় বেতের ছোট ছোট টেব্‌ল জোড়া লাগিয়ে একটা বড় টেব্‌ল করা হয়েছে, তাতে সকাল বেলার উপোস ভাঙা অর্থাৎ ব্রেক-ফাষ্টের নানা উপাদান—ফল, জ্যাম্, টোষ্ট, চা ইত্যাদি সাজানো। এমন সময় গ্রে ব্যাগম অাঁটা কোটটা কাঁধে ফেলা অবস্থায় সিগ্রেটের টিন হাতে উপরের সিঁড়ি দিয়ে টুটুলকে নামতে দেখা যাবে।

টুটুলকে দেখতে পেয়ে ব্রেকফাষ্ট টেব্‌লের সামনে বসে থাকা বাবলী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আগ্রহের সঙ্গে উতলা হয়ে বলবে

বাব্‌লী। এই যে টুটুল, সকালে এসে—
বিরক্ত তোমায় কর্‌চি শেষে।

টুটুল তখন বারান্দায় নেমে এসেছে, তারপর বাবলীর কথায় আশ্চর্য্য হয়ে

টুটুল। কিন্তু ব্যাপারটা কি সে তব ?

বাব্‌লী। তোমারে হেরিনু স্বপ্নেতে সে কী—
ধাক্কা লেগেছে মোটরেতে দেখি।
(শিউরে উঠে বাবলী)
কি আর তোমারে কব।
ওঃ, ধড়ে বুঝি প্রাণ আসে
আপাততঃ তুমি দেখিয়া পাশে,
(একটা নিশ্চিন্ততার ভঙ্গিতে নিশ্বাস ফেলে)
যাক্ এখন এবারে
ভাবনা-বিহীন হব।
(টুটুল বাবলীর ঘুমে ঢুলে আসা চোখ দেখে)

টুটুল। রাত্রিতে বুঝি হয় নাই ঘুম ?

বাব্‌লী। কি বলছ তুমি—ঘু-উ-ম ?
সারারাত জেগে সে কি মহা ধূম
যেন হার্টফেল্ হব হব।



(টুটুল বাবলীর কাছে ঘনিষ্ঠ ভাবে সরে এসে আলতো আদরে ওকে উপছে তুলে)

টুটুল। বেচারা বাবলু! আহা কি মিষ্টি
ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়িছে দৃষ্টি
এত নিদারুণ ভালবাসা তব
জানিতাম আমি কিবা!

(বাবলী একটু খুকীদের মত আহ্লাদিপনা করে বলবে)

বাবলী। যাও, যাও খালি চালাকী সবেতে
ঠাণ্ডা চা-টাই হবে দেখি খেতে

(এবার ব্রেকফাষ্ট টেবলে দুজনে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে কাছাকাছি হয়ে বোসে)

টুটুল। কথাতে তোমার গেছিলাম মেতে
তাতে, হোলো দোষ কিছু কিবা ?

বাবলী। ভালবাসি বলে সুবিধা পেলেই
খালি, রাগিবে সুযোগ নিয়া।

টুটুল। আবার দুষিছ শুধু শুধু মোরে
হে মোর রাগিনি প্রিয়া।

বাবলী। দোষ দেব কেন ছি ছি ছি ছি ছি
ঝগড়া করিছ কেন মিছিমিছি ?

ছুতো করে ছল একটি সে 'কিছি'
দেবে পৌঁছুতে গিয়া।
টুটুল। হায় রে কপাল, ফাটা সে কপাল।
তিন-তিনটে নিমন্ত্রণ।
এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে হায়—
রেগো না লক্ষ্মী ধন।
বাবলী। রইল মনেতে, রাখলে না কথা।
আড়ি আড়ি আড়ি আড়ি।
টুটুল। ঝুটমুট কেন ঝগড়া করিছ,
চল ওঠা যাক্ গাড়ী।

(টুটুল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেয়ারার দিকে হুকুমের সুরে বলে)

টুটুল। নিয়েছে সোফার গেরাজের চাবী
উস্‌কা বোলাও জলদি সে আভি,
নিকালনে বোলো টু-সিটারখানা
এক্‌খুনি তাড়াতাড়ি।

(এবার ঘুরে বাবলির দিকে চেয়ে টুটুল বলে)

টুটুল। পরশু বিকেলে
পাব কি গো গেলে
দর্শন তব ?
বাবলী। শত কাজ থাকে
তবু তারি ফাঁকে
আশায় নব
যদি দেখা পাই
তাই পথ চাই
তাকায়ে রব।

(সোফার গাড়ী ড্রাইভ করে বাবলীর গাড়ীর পিছনে গাড়ীবারান্দার

তলায় গাড়ীখানা বন্ধ করে গাড়ীর চাবি হাতে বারান্দায় উঠে এসে সেলাম দিয়ে বলবে)

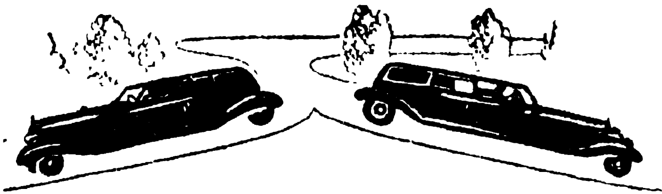
সোফার। হাজির, হুজুর, হয়েছে গাড়ী যে।

বাব্লী। তাড়াতাড়ি ওঠো চলি গো বাড়ি যে।

টুটুল। চল, বার হই একসাথে।

দিয়েছি কি ব্যথা কি জানি জানিনি
অভিমান কোন কোর না মানিনী
জানি আজ মোর
বেদনা-বিভোর
তাই ভেবে ঘুম নাই রাতে।

(টুটুল আর বাবলী নিজের নিজের গাড়ীতে একসঙ্গে বের হবে তারপর ফটক পেরিয়ে দুজনে দুপথে চলে যাবে।)



চার নম্বর দৃশ্য

(বাবলীর বাড়ীর পিছন দিক্‌কার প্রকাণ্ড বাগান। কোলকাতা সহরের মধ্যে যে বাগানটি নানা ফুলের গাছ ও ফলের গাছের জন্যে দস্তুর মত দর্প অনুভব করতে পারে।

একটা বড় গাছের ডালে ঝোলানো দোলনায় দুলতে দুলতে বিরহ-বিধুর বাবলী আপন মনে গাইছিলো।)

টুটুল্ টুল্‌টুলু টুল্ টুল্
মিষ্টি আমার!
তুমি এলে না, এলে না,
মনের মতন মিষ্টি—
তোমার মতন
মেলে না, মেলে না,

দোদুল্ দুল্ দুলু, দুল্ দুল্,
বিকেল বৃথায় বহে যায়—
হায় হায়!
মোরে নিয়ে গেলে না,
গেলে না সিনেমায়—
আ মরি মোর, বুকেরই বুল্ বুল্।

ডাডা ডাডা ডা ডারলিং।
ঢেউয়ের মতন চুল,
কুচ কুচে কালো কারলিং।
বিকেলে বেড়াতে যাওয়া
আজ হোলো ভুল্, ভুল্ ভুল্—
টুটুল্ টুল্‌টুলু টুল্ টুল্।



(খানসামা সেলাম দিয়ে বাব্‌লির কাছ বরাবর এসে বলবে।)

খানসামা। হুজুর সেলাম।

বাব্‌লি। কি রে কি চাই রে?

খান্‌সামা। রাতের খাবার কি খাবেন বাইরে?

(খানসামা খাবারের কথা জিজ্ঞেস করায় বাব্‌লি বিরক্ত হয়ে ওঠে, তারপর নিজের মনে বলে।)

বাব্‌লি। একটুকু একা—
সয় নাক তাও।
খালি জ্বালাতন।
(খানসামার দিকে ফিরে)
থোড়া পিছে আও—
(আবার নিজের মনে)
জানোয়ার কি যে খালি খাও-খাও—
(খানসামার দিকে ফিরে)
এই তো খেলাম।

(খানসামা বাব্‌লির মেজাজ ভালো নেই অনুমান কোরে আবার সেলাম দিয়ে চলে যাবে)

খানসামা। হুজুর, সেলাম।

(খানসামা চলে যাবার পর বাবলির খাস কাম্‌রার আয়া, যে বাব্‌লির কাপড়-চোপড় খাওয়া-দাওয়া থেকে ঘুমপাড়ানো অব্দি সব কাজ কোরে থাকে, সে ওভালটিনের কাপ ইত্যাদি সমেত ট্রে হাতে হাজির।)

বাব্‌লি। তোর, আবার কি তোর?
ভাগ্‌ যাও আভি—
মেজাজ বিগ্‌ড়ে রয়েছে যে জোর!

আয়া। বাহার গেছেন বড়া মাইজি,
সাহেব যান যে বেরিয়ে…

বাব্‌লি। এই গাড়িটাকে থামা—
জলদিসে চ্যালো,
থাম্‌তে বল্‌—

(বাব্‌লি দোলনা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে আয়াকে বলে)

বাব্‌লি। চটাপট নয়া শাড়ি নিকালো—
চল্‌ তাড়াতাড়ি…
চল্‌ চল্‌ চল্‌
আমিও আসব বেড়িয়ে।

পাঁচ নম্বর দৃশ্য

মায়াদেবীর টেরাস গার্ডেন সমেত ফ্ল্যাটের দৃশ্য—

(চৌরঙ্গির নিভৃত নির্জন একটি গৌরব-মণ্ডিত অঞ্চলে শ্রীমতী মায়া দেবীর উপর তলার ফ্ল্যাট, আর তার লাগাও বেশ একটু খোলা ছাত। ছাতে টেরাস গার্ডেনিং তৈরী করার একটা অপপ্রচেষ্টাও আছে যার মাঝে মাঝে বেতের নানা রকমের চেয়ার টেবল্‌গুলো নানা ভাবে ছড়ানো, কোথাও কোথাও বা উঁচু উঁচু কাঠের ষ্ট্যাণ্ডের থেকে ঝোলানো-শেডের অর্দ্ধেক ঘোমটার আড়াল থেকে বিজলি বাতিগুলো রমনীয় রহস্যময়ী নারীর মৃদু হাসির মত বিচিত্র রোশনাই বিতরণে ব্যস্ত।

মায়া দেবীর বয়েস পঁয়ত্রিশের বেড়া ডিঙোলেও যৌবনকে মুঠোর মধ্যে দম আটকে আটকানোর অদ্ভুত কৌশল যেন তাঁর করায়ত্ত করা। নানা বয়সী ছেলে-মেয়েদের নানা কথাবার্তায় কলহাস্যে বড় ঘরটি তখন মুখরিত। তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে কেউ কেউ বাহিরে বেরিয়ে আসছেন ছাতে, কেউ বা বসছেন বেতের চেয়ারে, কেউ বা আবার ঘরের ভিতরের কোনো উত্তেজক আলাপ শুনে যোগদান করতে ব্যস্ত-সমস্ত ভিতরে ঢুকছেন। ঘরের ভিতরটি দিশী-বিলিতি রূপ সজ্জায় একটা অদ্ভুত গোধূলি-দশা বিস্তার কোরেছে। পিয়ানো থেকে সেতার, এসরাজ, নিকেল করা লৌহ নলের কৌচ-কেদারা থেকে উত্তরায়নি-ওড়না-চাপা ফরাস-তাকিয়া কিছুই বাদ পড়েনি।

আদতে, এই শেষ সন্ধ্যার বিরাট চায়ের আসর কর্তাবিহীন শ্রীমতী মায়া দেবীর কর্তৃত্বে তখন বেশ জমজমাট। মোটাসোটা গোলগাল প্লামপুডিং টাইপের চেহারা বকু বোসের, যার চেহারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাসি পায়। সুযোগ পেলেই স্মার্ট ছেলেরা এবং বিশেষ কোরে মেয়েরা তার পা টেনে আছাড় খাওয়াতে চায় অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলে 'লেগ্ পুল্' বিশুদ্ধভাবে সবাই ওর উপর তাই প্রয়োগ করার জন্য সব সময় যেন প্রস্তুত।)

বকু বোস। নিত্য !

এ জীবনে সব বৃথা—

চাই ভালবাসা,
শুধু ভালবাসা।

মায়া দেবী। খাসা—
হাঃ হাঃ হাঃ হাসালে।

(বীণা রায় ছাত থেকে হাসি শুনে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে)

বীণা রায়। কি এতো যে হাসি ?···

(বকু বোসের কউচটার হ্যাণ্ডেল বোসে এলা গুপ্তা)

এলা গুপ্তা। বলো না বকু—
মোরা বেশ করি ভালবাসি।

(রাজীব সোম বকুর পাশে বসা এলা গুপ্তার 'মোরা ভালবাসি' এই কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে)

রাজীব সোম। অ্যাঁ, বলো কী ?
(তারপর ঘুরে চলমান বীণা রায়ের দিকে চেয়ে)
আরে আরে চল কি ?
দেখি, সকলেরে তুমি ত্রাসালে।

(রাজীব সোমের উপর কর্ত্তৃত্বের সুরে)

বীণা রায়। দেখ, মুখে চাবি।

(এই বলে নিজের ঠোঁটের উপর একটা আঙুল রাখবে)

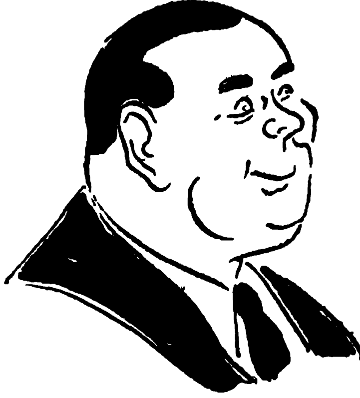
ভুলু ঘোষ। ওঃ, তোমার কথায়
ও' যেন খায় খাবি।

মায়া দেবী। দেখো দেখো দেখো,
ওদিকে দেখেছো—
নজর কোথায় তোমরা রেখেছো ?
বুকুকে এলা যে জোর কোরে ভালবাসালে।

(লিলি, মিলি আর বেলাকে হাত ধরে চৌকি থেকে টেনে তুলে বলবে)

লিলি ওরা ঘরে মেতে রহস্য কথাতে
কানামাছি খেলি…
চলো যাই ছাতে।

(ওদিক থেকে বকু বোস চিৎকার কোরে)



বকু বোস। আমিও খেলবো আমাকে নাও,
কানামাছি হোতে আমাকে দাও।

বেলা। এদিকে এসো, রুমালটা কৈ ?

(ট্রাউজারের কোটের নানা পকেট হাতড়ে রুমাল না পেয়ে জিভ বের কোরে বকু বোস বলবে)

বকু বোস। ডলির বাড়িতে এসেছি ফেলে—
য়্যা, যাঃ ঐ।

(প্রশান্তর দিকে চেঁচিয়ে মিলি বলবে)

মিলি। প্রশান্ত, এই, রুমালটা দাও—

প্রশান্ত। ছুঁড়ে দিচ্ছি যে,
এই লুফে নাও।

(এবার বকুকে লিলি মিলি বেলা হাত ধরে, কেউ টাই ধরে চোখে রুমাল বাঁধা অবস্থায় ছাতে টেনে এনে ছেড়ে দেবে)

লিলি। ভালই হোলো বকুকে পেয়ে
ঘুরবে কেবল চাঁটি যে খেয়ে।

(মেয়েরা তখন কেউ ওকে চাঁটি মারছে, কেউ চিম্‌টি কাটছে, ও' একটা টেবিলে লেগে হোঁচোট খেলো, একবার একটা চৌকিতে লেগে উল্টে চিৎপটাং হয়ে পড়লো, তার পর দাঁড়িয়ে কাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলবে)

বকু বোস। উঃ, এতো জোরে জোরে
মারছো কেন ?
মাথাটা আমার জমীন্ যেন।
ইস্, কোটটা আমার হোলো যে মাটি—
চাঁদা কোরে খালি মারছো চাঁটি ?

(সবাই মিলে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে)

--কানা মাছি ভোঁ-ভোঁ—
বকু বোস হো হো।

বকু বোস। গেলুম লিলি—
রামচিম্‌টি কেটো না মিলি
চিম্‌টি কাটে অমন কোরে ?
বিছের কামড় জ্বলছে সারা শরীর ভোরে।

মিলি। বোকারাম করছো যে ভুল।
আমাদের চাঁপার আঙুল—
চিম্‌টি কভু কাটতে পারে ?

বকু বোস। এবার ফেলবো খুলে রুমালটায়
কালসিটে যে পড়লো গায়,
বেওয়ারিশ মাল আরে—আরে—
মারছো কেন বারে বারে ?
গেলুম গেলুম ওরে বাবা রে।

(সবাই মিলে বকু বোসের রকম দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে নাচতে নাচতে হাততালি দিয়ে)

মেয়েরা সবাই। কানা মাছি ভোঁ-ভোঁ—
বকু বোস হো হো।

(ছাতে রেলিং-এর ধার ঘেঁসে এক কোণে দাঁড়িয়ে শিলা আর সঞ্জয় তখন কথা বলাবলি করছে। ছাতের উপর থেকে অদূরে তখন অজগরের মত এঁকে-বেঁকে পড়ে থাকা চৌরঙ্গির পথগুলি, ময়দান আর দূরান্তের শীতের চন্দ্রালোকিত শহর যেন ওদের পটভূমিকার কাজ কোরছে)

(অল্প অভিমানের সুরে)

শিলা। তুমি তো আমায় বাস না ভালো—

তবে, কেন মিছে শুধু কথা কও ?

(শিলার ঠোঁটে চাবি ঘোরাবার ভঙ্গিতে আঙুলটা ঘুরিয়ে)

সঞ্জয়। দেখো রাগিও না মিছে,

হবে না ভালো…

চাবি দেব ঠোঁটে, চোপ্‌রাও।

(ঠোঁট উল্টে ভুরু কুঁচকে)

শিলা। ভারি তো,

যেন ভয়ে মরি মরি তুমি শাসালে।

(এমন সময় পাশের সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের এক পাশের লম্বা টানা জানলা মারফৎ টুটুলকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে দেখে একটা কউচে কথোপকথনরতা লিলি আর নিতা চোখে চোখে ইসারা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের আড়াল দিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ ইসারা মিশিয়ে নিতা মিলিকে বলবে)

নিতা। দেখো, দেখো,

হাজির, সেই যে…

(টুটুলকে আসতে দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে প্রশান্ত সিংহ বললে)

প্রশান্ত সিংহ। আরে রে এই যে—

টুটুল হাজির।

(প্রেমতোষ মায়া দেবীর সামনে হাজির হোয়ে হাত পেতে কতকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে)

প্রেমতোষ। দাও তো এবার টাকাটা বাজীর।

কে—ম—ন—
হেরেছো এ—খ—ন—?

(মায়া দেবী টুটুলের উপর মালিকানা ষোলো আনা জাহির কোরে)

মায়া দেবী। ওর না এসে উপায়
ছিল কি কিছু?
পেত্নির মত পায় পায় ওর
নিতাম পিছু।
যদি মরতাম?
জেনো, ভূত হোয়ে গিয়ে ধরতাম।

(বুকের উপর ডান হাতটার বুড়ো আঙুল বের করা অবস্থায় মুষ্টিবদ্ধ ভাবে রেখে নিজেকে দেখিয়ে)

মায়া দেবী। এই, এর কাছে জেনো—
মরলেও জেনো ছাড়ান নেই।

(সাধারণত অন্য দিনের মত টুটুল মায়া দেবীর কথার পটাপট পাল্টা জবাব আজ না দেওয়ায় একটু হতাশার সুরে লিলি বললে)

লিলি। আচ্ছা টুটুল,
চুপ কোরে কেন?

বীণা রায়। আজকে কি জানি গুম্ খেয়ে হেন?

(এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুটুলের টোল খাওয়া গালে টোক্‌না মারার ভঙ্গিতে আদর করতে করতে মায়া দেবী বললে)

মায়া দেবী। লক্ষ্মিটি,
আমার প্রাণের পক্ষিটি
কও, কথা কও—
এই, মেরিজান এই।

(এমন সময় মন্টু রায়কে ঘরের সেই জানালাটা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দেখা যাবে, তার পর ঘরে ঢুকে মন্টু রায় মায়া দেবীকে নমস্কার কোরে জিজ্ঞেস করবে)

মণ্টু রায়। টুটুল এসেছে ?

(মায়া দেবী মণ্টু রায়ের কথার উত্তর না দিয়ে বলবে)

মায়া দেবী। কিন্তু আসবে না তুমি
সবাই ভেবেছে।

(একটু চেঁচিয়ে ঘরের আর এক প্রান্ত থেকে শিলা বলবে)

শিলা। ম—ন—টু—উ—উ

বকু বোস। কু—উ—উ—উ

শিলা। ওধারে কোথায় ?
এদিকে এদিকে।

লিলি। এসো এইখানে টুটুল যেদিকে।

(টুটুলের কাছে মণ্টু হাজির হওয়ার পর টুটুল বলবে)

টুটুল। এতো যে দেরী ?

(মণ্টু নিজের রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে তাকিয়ে)

মণ্টু রায়। তাই তো হেরি।

টুটুল। কেন দেরী হলো, এরা যে—
করতে চাইছে জেরা যে।

(ভুলু ঘোষ মণ্টু রায়কে বলবে)

ভুলু ঘোষ। দেরী দেখে ওরা বলছে সবাই
কোঁকোর কোঁ করবে জবাই।

প্রশান্ত সিংহ। তোমার উপরে বেজায় ক্ষেপেছে।

মণ্টু রায়। নতুন কথা কি আছে তাতে ?
আমরা সবাই
নিত্য জবাই
চলছি হয়ে ওঁদের হাতে॥

টুটুল। হোলো দেরী কিসে ?

মণ্টু রায়। আপিসে।

গেলুম আটকে
যায় কি করা।
ভুলু ঘোষ। তা বটে, তোমাকে ধরা—
নিতা। বললুম না আর
যে যাবে ধরতে…
কি বল নিতা
কে চায় মরতে ?
(বীণা রায় একটু দুষ্টুমির সঙ্গে)
বীণা রায়। জানি, জানি
শেষকালে সে যে নিজেই ফেঁসেছে…
হো হো হো—বলেছে বেশ।
(মায়া দেবী মণ্টুর দিকে চেয়ে)
মায়া দেবী। যাই হোক তুমি এসে শেষ মেষ
রেখেছ মুখ।

(নিজের বুকের ছাতিটা নিশ্বাস টেনে বাড়িয়ে দু'হাত দিয়ে তা দেখিয়ে সঞ্জয় বলবে)

সঞ্জয় সোম। দেখো দেখো ফুলে
উঠেছে বুক
মায়া দেবী। স্পর্ধা, আমার ডাকে,
কে আছে এমন আটকে রাখে ?
(টুটুল মায়া দেবীকে ঠাট্টা কোরে)
টুটুল। জানে না তো লোকে
তোমার ও-চোখে
রয়েছে বিষ।
মায়া দেবী। সাহস তো দেখি
হয়েছে ইস্।
এ কি,

দেখি, ভয় ডর কারো নাহিকো লেশ

বকু বোস। ওহে বড় বড় হোম্‌রা চোম্‌রা।
আর কেউ ভয় পেয়েছো তোমরা?

(ভয়ের ভান কোরে)

বকু বোস। আমি নিশ্চিত পেয়েছি ভয়
পেয়েছি ভয়

(মায়া দেবীর গা ঘেঁসে এসে বোসে)

বকু বোস। তোমার কাছেতে ঘেঁসে এসে বসা
সুবিধার বড় মোটেই নয়।

(মণ্টু রায় টুটুলকে বলবে)

মণ্টু রায় রয়েছে কথা, চলো যাই নেমে।

ভুলু ঘোষ। এই শীতে দেখি গিয়াছো যে ঘেমে!

সঞ্জয় সোম। ঘরটা বেজায় গরম যেন।

প্রশান্ত সিংহ। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চলো ময়দানে।

রাজীব। পায়চারি কোরে আসি না কেন?

মায়া দেবী। মায়া দেবী করছে জাহির
হবে না কেহই ঘরের বাহির।

প্রেমতোষ। সত্যি সত্যি যেন মনে হয়
আবহাওয়া ঘরে উত্তাপময়।

ভুলু ঘোষ। বাক্য-বহ্নি বোমার মতন
ফেটে পোড়ে জ্বলে দাউ দাউ।

বকু বোস। ক্ষিদে পেয়েছে যে, চিনে হোটেলেতে
খেয়ে আসি চলো 'চাউ চাউ'

(টুটুল লিলির হাত ধরে বলবে)

টুটুল। তার চেয়ে এসো
লিলি তুমি এসো

ভুলু ঘোষ। মাঝে মাঝে খালি মুচ্‌কিয়ে হেসো

টুটুল। আনো তোমার ঐ এসরাজখানা
মারো লীলা ভরে ছড়ের টানা।
এসো তো এদিকে নিয়ে
তোলো ঝড় সুর দিয়ে।

(উষাকে ডেকে)
এই, এই দিকে উষা।

(উষা কৌচ থেকে উঠলে ওর কাপড় পরার নতুন কায়দা দেখে
দেখি দেখি, বাঃ!

মন্টু রায়। তোফা হয়েছে তো বেশ-ভূষা।

টুটুল। নি' এসো সেতারটারে
হানো তার তারে তারে
মেঘ-মল্লারে তোলো তোলো ঝঙ্কার।

লিলি। বোলছ কি তুমি?
এই শীতে মল্লার!

টুটুল। হ্যাঁ, উত্তাপ অত হল্কার মত,
—শেষ হোক হল্লার।

(এলার হাত ধরে টেনে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে)
এসো, এসো, এলা!

ভুলু ঘোষ। তোমার কাছেতে
প্যাভলোভা আর মেনকা নাচেতে
ছোঃ, করে যেন ছেলেখেলা।

টুটুল। ঘুঙুর বেঁধেগো একবার দেখি
মার চোখে টঙ্কার।

এলা। নাচবো কোনটা?

মন্টু রায়। যা' খুশী তাই।

টুটুল। হুকুম করার
কেহই নাই।

(নাচ আরম্ভ কোরবে এলা। মায়া দেবী খানসামাকে ডেকে বলবে)

মায়া দেবী। আওর এক দফে
ঘুমালেও ট্রে।

(সকলের দিকে ফিরে বলবে)

—বলেছি চা দিতে।

বীণা রায়। দেখি হোয়ে গেল দেরী
হোলো কি গাড়ির···

মায়া দেবী। এখনো যে বড় এলো না নিতে ?

(প্যাটি, পেসট্রির, স্যাণ্ডউইচের ট্রেগুলো নিঃশব্দে বেয়ারাদের হাতে হাতে আর এক দফা ঘুরে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে যে যার ইচ্ছামত চায়ের পেয়ালা আর কিছু কিছু খাবার উঠিয়ে নিয়েছে নিজের নিজের প্লেটে। এলার নাচও বেশ তখন জমে উঠেছে। তার পর সকলের করতালির মিলিয়ে আসা ধ্বনির সঙ্গে এলার নাচও মিলিয়ে এসে শেষ হোলো।)

টুটুল। ঘড়িটায় দেখি
হয়েছে অনেক রাত।

মায়া দেবী। তাতে কি হয়েছে ?

লিলি। বিয়ে না হলেও বাসরের মত

মিলি। রাতের আসর হোক পরিণত।

এলা। সারা রাত জেগে সবার উপর
করা যাক বাজিমাৎ।

মণ্টু। চলুক 'ফ্লাস্' কিম্বা 'পোকার'

বীণা। কেন, বকু বোস আছে জ্যান্ত জোকার

লিলি। কিন্তু ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে
লাভ কি বলো ?

শিলা। মোটর রয়েছে, তার চেয়ে লেকে
চলো গো চলো।

মায়া দেবী। আজ নয় কাল
যাওয়া যাবে চলো।
প্রশান্ত। রয়েছে যে পূর্ণিমা
ভুলু ঘোষ। চাঁদের আলোয়
আহত হয়ে যে
ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্নিমা।
মণ্টু। এখন রাঁচি
না পাঠালে বাঁচি।
যাত্রার আগে শুভ কামনায়
হ্যাঁচ্চো দিলাম হাঁচি।
প্রশান্ত। আজকের চেয়ে
কালকেই ভালো।
কি বলো, হে কি বলো ?
লিলি ও মিলি। সবাই মিলে লেকে গিয়ে কাল
সাঁতার কাটবো চলো।
বীণা। সখ থাকে কারো
এই শীতে লেকে
সাঁতার কাটিও রাতে।
মায়া দেবী। পড়ে যদি কেউ নিউমোনিয়ায়
দোষ নেই মোর তাতে।
টুটুল। সুইটসারল্যাণ্ড লেক লুসানে
কেটেছি সাঁতার।
মিলি। কোলকাতার এই শীত তার কাছে
ভারিতো ছাতার।
লিলি। ডিসেম্বারেতে কাশ্মীরে আমি
ঘুরেছি কত।

শিলা। লেকের জলের শীত তার কাছে
মশার মত।

(বকু বোস হাত-পা তুলে কচি খোকার ভঙ্গিতে)

বকু বোস। আমিও যাবো, আমিও যাবো,
আর একটা কেক্ প্যাটিও একটা
একটু খাবো।

(বীণা রায় পাশে রেখে দেওয়া প্যাটির প্লেটটা তুলে বকুর কাছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বকু প্লেটটা এক হাতে নিয়ে আর এক হাতে বীণা রায়ের আঙুলগুলো ধরে গদগদ ভঙ্গিতে)

বাঃ, আংটিটাতো বেশ
কিন্তু হীরেটা বাজে
অনুমতি হলে প্রেজেণ্ট একটা…
বলিনি লাজে
আঙুলগুলো কি অপরূপ
আহা মানাতো বেশ।

(হাতটা টেনে বকুর হাত থেকে ছিনিয়ে)

বীণা। বাজে বক্ বক্ কোরো না বকু,
ন্যাকামি সহ্য হয় না লেশ।

(সঞ্জয় দূর থেকে বীণা রায়ের হাত ধরে বকুকে হ্যাংলাপনা কোরতে দেখে)

সঞ্জয়। আবার তুমি এখানে এসেছো,
দাঁত বার কোরে ফের যে হেসেছো?

(বকুকে বীণা রায় একটু ঠেলে)

বীণা। যাও না ওখানে ঐ তো এলা

(চিৎকার কোরে বকু বোস কান্নার সুরে)

বকু। ওগো বন্ধুরা দেখো দেখো ওরে
বীণা রায় মোরে মেরেছে ঠেলা।

(লিলি বকুর কাছে এসে পিঠে হাত রেখে)

লিলি। বল কি বকু কালকে পার্টিতে
থাকতে তুমি হবে কি হাঁটিতে ?

(বকু এবার হেসে ফেলে আনন্দে আটখানা হয়ে)

বকু। তোমার হুকুমে
জেগে কিবা ঘুমে
স্বপ্ন দেখি যে

(বকুকে ঠেলা মেরে মণ্টু)

মণ্টু। বল না হে, কি যে…
বকু। রাত হয়ে যাবে ভোর
বরাত সে যেন চিচিংফাঁক
খুলেছে দোর
সঞ্জয়। কি হবে তা'পর বল না হে কেন
বকু। শিশ মেরে শুধু সাথে নিয়ে যেন
চলি ট্যাক্সির সারি।
লিলি। সুইমিং পুলে সাঁতারের পর
মনে থাকে যেন—
নতুন শাড়ি।
বকু। দেব আমি দেব উপহার।

(পা'টা উঁচু ক'রে বকুকে দেখিয়ে মিলি বোলবে)

বীণা। আরে জুতোর ফিতেটা গিয়েছে খুলে

(বকু বোস বীণার জুতোর ফিতেটা বেঁধে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করবে)

বকু। —যা হবে খরচ সব তো আমার ?

(এলা ইচ্ছে কোরে রুমালটা মাটিতে ফেলে)

এলা। রুমালটা বকু দাওতো তুলে।

(বকু বোস আবার রুমালটা তুলে দিতে দিতে বলবে)

বকু। মালপত্তর বহে আনবার

মায়া দেবী। সেটাও তোমার
আর কি চাই ?
বকু। ফুরিয়ে গেল যে এরি মধ্যে
কিছুই কি নাই ?

(আর এক প্রান্তে বসে থাকা টুটুল দাঁড়িয়ে উঠে একটু চেঁচিয়ে সকলকে বলবে)

টুটুল। আজকে আমি যে
উঠলাম তাড়াতাড়ি
ইলার সঙ্গে দেখা করা চাই
ঘুরে যেতে হবে বাড়ি।

(সকলে কৌতূহল আর হিংসে মেশানো সুরে বলবে)

সকলে। ইলা ইলা ইলা, কোন ইলা ?
মিলি। কেন মিথ্যে করছে অছিলা
মায়া দেবী। কাগজেতে জানি
বেরিয়েছে ছবি যার।
শিলা। কাজের মধ্যে আছে যার শুধু
চাঁদা আর লেকচার
এলা। তা ভালো তা ভালো বেশ
বীণা। ঐ মেয়ে শেষ মেশ
বকু। হা হাঃ হা হাঃ হুররে
চালাও চানাচুররে।
মায়া দেবী। দেশের উপর দরদ এতোটা
টুটুলের মত লোক
শিলা। বাঃ উন্নতি হয়েছে
এলা। আরো হোক আরো হোক।
মায়া দেবী। চিয়ার ইউ টুটুল।
টুটুল। দেখি একূল ওকূল ভাঙলো দুকূল

সঞ্জয়। তবু তো চলেছে হাসি

টুটুল। হাসবো তখনো ললাটে যখনো
লটকানো লেখা ফাঁসি।

মিলি। ঝগড়া হলেও মনে থাকে যেন
কাল যেন দেখা পাই।

এলা। পূর্ণিমা রাত পার্টিতে তোমারে
মনে রেখো চাই-ই চাই।

(অভিমানে অপমানে আহতা মায়া দেবীর সম্মুখে নত মস্তকে)

টুটুল। রানি,
তথাস্তু তবে তাই হোক স্থির
দিলাম অভয় বাণী

(সকলের দিকে ঘুরে)

বললুম সবে
চললুম তবে
চিয়ার ইউ, চিয়ার ইউ।

বকু। দিল্লির থেকে বিল্লির মত
আমি কাঁদি মিউ মিউ।

মায়া দেবী। চুপ করো বকু চুপ।

বকু। চুপ কোরে এই বোসে পড়ি আমি ধুপ।

ইলা-টুটুল সমাচার

(টুটুলের গাড়ি চলেছে তখন চৌরঙ্গি দিয়ে, শীতের কুয়াশা, তার পর ধোঁয়াও নেমেছে, তবু পূর্ণিমার আগের রাতের আবছা চাঁদের আলো, ফিনফিনে অন্ধকার রংয়ের জর্জেট শাড়ির তলায় চাপাপড়া অজানা রূপসীর দেহলতার লাবণ্যের মত ফুটে বেরুচ্ছে চারি ধারে। টুটুল কখনো শিশ্ টেনে, কখনো গুন্ গুন্ কোরে, কখনো জোরে গান গেয়ে চলেছে গাড়ি চালিয়ে)

(গান)

টুটুল। ও কুয়াশা, কালো কুয়াশা,
কুকাজ করিস কেন ?
আমার প্রিয়ার চাঁদ মুখেতে
ঘোমটা টানিস হেন ?
কোলকাতারই বুক—
প্রিয়ার ঘোমটা ঢাকা সে মুখ
ও তার ওড়না-ঢাকা অঙ্গ ঘিরে
চুমকির চুম্ চুম্।
ঢাক্না-চাপা বিজ্‌লী বাতির
ঝুম্ ঝুমি ঝুম্ ঝুম্।
ধোঁয়ায় ঘেরা চাঁদের আলো
লজ্জা ও তার যেন।
ও কুয়াশা কালো কুয়াশা
কুকাজ করিস কেন ?



(মোটর এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। টুটুলের বাড়ি বরাবর কোন একটা চৌমাথার কাছাকাছি। মোড়ের উপর একটি মেয়ে— কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে, সাধারণতঃ কোন রাজনৈতিক দল-বিশেষের মেয়েরা যেমন ঝোলায় তেমনি ভাবে ঝোলানো। বাসের ষ্টপে দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারাটা দেখা গেলেও, মুখটা স্পষ্ট নয়। টুটুল দূর থেকে মেয়েটির অস্পষ্ট চেহারা দেখে)

টুটুল। ইলা না ? হ্যাঁ দাঁড়িয়ে রয়েছে,
তাই তো এ কি ?
গাড়িটা ঘুরিয়ে সামনের থেকে
মুখটা দেখি--

(গাড়িটা ঘুরিয়ে মেয়েটির সামনে এনে একটা দরজা খুলে দিয়ে)

ইলা দেবি, পরিসরে ছোট, অধম আমার রথ
ধন্য হোতো তোমার পায়ের স্পর্শে
কল্পকথায় কত না পেরিয়ে পথ
বাড়িতে তোমায় পৌঁছে দিতাম হর্ষে।

ইলা। ধনিকের এই ক্ষণিকের দয়া কি কাজে
আসে ?
ভগবান দেছে পদতল গাড়ি, নইলে বাসে—

টুটুল। এই ভিড় ভেঙে বাসেতে উঠবে বাদুড়
ঝুলে ?
হোতেই পারে না, গাড়িতে তোমায়
নেব যে তুলে।
আশা করি কিছু, ইলা দেবী এতে,
অমত তোমার নেই।

ইলা। নিশ্চয়ই অমত আছে।
ভুলো না টুটুল,
আমি নই সেই মেয়ে জেনো,

যেন আর
কোরো নাক ভুল ;
উঠবো গাড়িতে,
শিষ মেরে তুমি, ডাকবে ভেবেছো যেই ?
টুটুল। তোমারই বাড়িতে চলেছিনু ইলা, বিশ্বাস করো—
সৌভাগ্য যে দেখা হয়ে গেলো, গাড়িতে চড়ো।
ইলা। পুঁজিপতি।
গরীব ভোলে না গর্ব্ব যে তার সহজে অতি,
পদতল গাড়ি গরীবের আছে,
আছে ট্রাম বাস কত
নোংরা হবে যে আমি যদি উঠি
দামী গাড়িখানা অত।
টুটুল। জেনো ইলা জেনো,
ভাগ্য মানবো গাড়ির আমার—
ইলা। উঠি যদি আমি।
বন্ধু যার কুলি-মুচি, চাষি ও কামার ?
টুটুল। হ্যাঁ তাই, বিশ্বাস করো তাই,
লক্ষ্মী মেয়ের মত চলে এসো গাড়িতে বসিগে যাই।
ইলা। বলতে কি চাও দেখবো তা'পর,
কেমন কোরে অতঃপর—
সাঁড়াসির মত বাহু দুটি তব বাড়িয়ে,
রক্ত শুষে গরীবগুলোর
চালের সাথে চলবে তুমি নিত্য তাদের
বুটের তলায় মাড়িয়ে ?
টুটুল। মিছি মিছি ইলা
চটছো কেন ?
ইলা। বৃথা মিছে আমি চোটবো কেন ?

টুটুল। বল না কি দোষ করেছি আমি ?

ইলা। কি করনি'ক তাই বলো ?

টুটুল। তোমার হুকুম শুনে,
পাই পয়সাটি চলি গুণে।
কিনিনি কোনো কিছুই সখের—
স্যুটটা দেখনা চান্‌নি চকের,
টাইটাও নয় দামী !
এবারে গাড়ীতে বোসবে চলো,
দোষটা আমার কোথায় বলো ?
সত্যি বুঝিনে কেন—
আমার উপর বিনা দোষে তুমি
বিগড়ে রয়েছো হেন।

ইলা। ক্লাব আর মদ
মদ আর পার্টি
বেলেল্লায় বিল্‌কুল্ হয়েছো যে মাটি।

টুটুল। চটেছো বেজায়, অকারণে কেন
বৃথা হও দুর্ম্মুখ ?
তোমার মুঠোয় প্রাণপাখি মোর
করে যেন ধুক্‌পুক্।

ইলা। ভুলে যেতে চাই, তবু মনে পড়ে—
কিছুতে হয় না ভুল !
এই যে তোমার টু-সিটার গাড়ি,
বালীগঞ্জের আর বড় বাড়ি,
আজকে, দেশের দুর্ভিক্ষের মূল।

টুটুল। দুর্ভিক্ষ হলো সারা বাঙলায়
আমার দোষে ?



পাগলের মত বকছো কি বাজে
বৃথাই রোষে ?
ইলা। হ্যাঁ তা-ই-ই---
তোমরাই দায়ী।
অনাহারে অনাবৃত পৌষের রাতে
অকাতরে এই যারা মরে ফুটপাতে
আস্তাকুঁড়ে এঁটো চেটে খায় কলাপাতে
তারই রক্ত শুষে তুমি ননীর পুতুল !
টুটুল। তারা যদি মরে বুঝিতে পারি না
আমার দোষ কি তায় ?
দিয়েছি চাঁদা তো দুর্ভিক্ষেতে
যখনি যাহারা চায়
ইলা। বাহাদুর বটে, দাতা কর্ণ যে।
শুনিতে চাহি না আর।
পথ ছাড় তুমি, যেতে দাও মোরে
বকিও না বার বার।
টুটুল। বাহু বলে নয় বুদ্ধির বলে
টাকা করেছি যে ছলে কৌশলে
তাতে রাগ কেন মিছে অকারণ,
বল না দোষটা কার ?
ইলা। তোমাদের কাছে, তাই হবে—
জানি তাই হবে।
যুদ্ধের হাটে মুনফা মেরেছো
যতেক প্রভু—
টুটুল। পয়সা পাবার সুযোগ কেহ
ছাড়তো কভু ?
ইলা। তোমরা মোটরে হল্লা করে ঘুরছো যবে···

টুটুল। সময় কাটে না, কি আর আমরা করবো ভবে ?
ইলা। খেয়াল খুশীতে কত না খাবার অর্থ আর
মাড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলে চলে যাও ভ্রূক্ষেপ হীন
অন্ন অভাবে এই নগরীর পথে পথে কত
হাহাকার কোরে নিত্য লোকেরা মরেছে দিন।
টুটুল। চুপ করো ইলা, পায় পড়ি তব—
যা যা বলো সব মানিয়া লব
তোমার কথায় উঠ-বোস কোরে
দিন যে কাটাতে চাই।
কপালের লেখা কি আছে কে জানে—
আজো আমি জানি নাই :
ইলা। সারাদিন যাহাদের লাগি
মরি আমি খেটে
ট্রামে, বাসে, বস্তিতে বস্তিতে
কখনো বা হেঁটে···
টুটুল। তবু রাগ, এতো রাগ, মার্জ্জনা করো
ক্ষমা কি গো নেই, নেই ?—
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বড়লোক বলে
গালাগালি খালি সেই।
ইলা। অনুরোধ তুমি করছো এমন,
ফিরাবো তোমায় কি বোলে কেমন
ভাবিয়ে তুলেছো অতি।
বাড়িতে ফিরিয়া যাবার এ পথে
না যদি উঠি গো পুষ্পক রথে
তাতে হবে কি এমন ক্ষতি ?
তোমার বিরাট বিকট 'বুইক্'
প্রণাম তাহার প্রতি।



টুটুল। বিধাতায় আর বরাতে মিলিয়া
দিয়েছে টাকা।
তাতে অধমের কি আছে হাত ?
লেক্‌চার রেখে চলো চলো ওঠো
বহুত বোকেছো, হয়েছে রাত।
(ইলা দেবী গাড়িতে উঠে এবার হেসে বলবে)
ইলা। তোমার গাড়িতে বেমানান আমি
তবু উঠলাম এ কি !
কোথা নিয়ে যেতে কোথা নিয়ে যাও
চালাও কেমন দেখি।
টুটুল। জানি গো তোমার মনের ফটক
আমার তরে
বন্ধ করিয়া রেখেছো নেহাৎ
নিঠুর করে।
ইলা। গরীবের ঘরে ধনীর প্রবেশ
কখনোই শুভ নয়।
আগমন জানি তাদের হলেই
অঘটন কিছু হয়।
টুটুল। জানি আমি এলে তোমার কাছেতে
অশুভ আনি যে সাথে,
অন্যে কিন্তু মোরে কাছে পেলে
চাঁদ যেন পায় হাতে।
ইলা। ভালবাসি বলে তাই তো তোমায়
আঘাত হানি।
তা না হোলে ভারি পড়েছিলো দায়।
টুটুল। মানি গো মানি—
তাই তো যতই যেখানে যাই না,

যত পার্টি মদ, যা খুশি খাই না—
আমার মনের সিংহাসনেতে
তুমি গো রাণি।

ইলা। উচ্ছ্বাসময় কাব্যে আমার
বিশ্বাস নাই।
দেশের কাজেতে কিছু লাগো তুমি
এইটে চাই।

টুটুল। পারিনে পারিনে দলাদলি-ভরা
দলপতিদের পায় পায় ধরা
আমার ধাতেতে খোশামুদি করা
আজো আমি পারি নাই।

ইলা। দেশের কঠিন কাজ না পারো
গৌরবময় যত।
দেখেছো কি দেশে কীর্ত্তি যা আছে,
সৌরভ শত শত?

টুটুল। বিলেতের যত ছবির গ্যালারি
দেখেছি বহুৎ বার।
'মাতিস্' দেখিয়া মাতিয়া গেছিনু
'পিকাসো' দেখেছি আর।

ইলা। বিলেতে গিয়েছো, কিন্তু দেশের
এলোরা দেখেছো তুমি?
আগ্রায় যেথা তাজের তলায়
মম্‌তাজ আছে ঘুমি।
অজান্তা জানি আজিও অজানা
তোমার কাছে।
'পল্ গোগ্যাঁ' তবু চোখের দেয়ালে
লাগানো আছে।

টুটুল। হল্লায় পড়ে গোল্লায় গেছি
বোলো না বোলো না আর—
ঘুরে আসবো যে সারা দেশময়
নিশ্চিত এইবার।
টুটুল। পৌঁছে গিয়েছি কথায় কথায়
ইলা। বহুৎ জানিও ধন্যবাদ।
দয়া কোরে হর্ণ বাজিও না আর
মনে হয় যেন সিংহনাদ!
বিদায় নিলাম বন্ধু এবার।
টুটুল। আবার কখনো দেখা কী হবে?
ইলা। হয় তো বা হবে, কিন্তু জানি না
কি জানি কখন, কোথায় কবে?



দু নম্বর দৃশ্য

(টুটুলের বাড়ির বেডরুম। দুপুর বেলায় কেউ কোথাও নেই। চাকর বাকররা সব যে যার আড্ডা মারতে কিম্বা দিবা নিদ্রার জন্যে সরে পড়েছে। এই সুযোগে খাস কামরার খানসামাটি টুটুলের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের জিনিষ পত্তরগুলো নাড়তে নাড়তে বলবে)

খানসামা—সাহেব তো নেই এই বেলাতে
ফর্সা হবার দাবাই
বিবিকে এনে লাগিয়ে দেব কি
ড্রেসিং টেবিলে যা পাই

(সিঁড়ির রেলিং ধরে ঝুঁকে নিচে আগতা বিবিজানকে উদ্দেশ কোরে)

মেরি বিবিজান বিবিজান মেরি
ওরে, বাসরাই মেরি গুল
আর দুটো চিজ চুরি করলেই
তোরে বানিয়ে দেব যে ফুল

(সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসতে আসতে বিবিজান হাঁপাতে হাঁপাতে বলবে)

বিবি—সিঁড়ি বেয়ে ছুটে উপরে আসতে
গিয়েছি যে আমি হাঁপাই
খানসামা—সাব নেই আভি এই বেলা চল
বিবি—কোথা গেছে আর বেহারার দল
খানসামা—চুপি চুপি চল বাজাস না মল
যাস না অমন লাফাই
কোমোর জড়িয়ে হাতে হাত দিয়ে
মেম সাহেবের মত
বিবি—দিনের বেলার লাজ লাগে মেরি

খানসামা—মিছে লাজ তোর অত
সরম আভি না করিস কিছু
কোই নেই হ্যায় উপর নিচু
যা কিছু এবার নেবার নিয়ে নে
পিছু, আফশোষ হবে কত
আসছে কে যেন, তাড়াতাড়ি কর
জলদি পালাই আয়
বিবি—কালা হো গিয়া বদন হামবা
কেয়া করে হায় হায়
(কপাল চাপড়ে বিবিজান ফুঁপিয়ে উঠবে)
খানসামা—রোনা মাৎ মেরি পিয়ারি হামেরি
সব কৈ যব নিকাল যায়গা
তোম হাম কাল ছিপছিপাকে
কোই নেই দেখে এসেই আয়গা
বিবি—মগর বদন হামরা বদমাস তোম
বনায় দিয়াল বুড়া
খানসামা—চলো চলো কসন বাঁচাও তো প্রাণ
পিছে মিলেগা রতন চূড়া
বিবি—বদমাস তোম বরবাদ কিয়া
মেরি চাঁদকা মাফিক মুখ
গাড়ওয়ান যেসা গাঁও সে আয়া
দেহাত কা উল্লুক
খানসামা—মাফি মাংতা কসুর হো গিয়া
বিবি—তবতো লাগিয়ে এইঠো
(জুতোর সাদা কালির শিশিটা দেখিয়ে)
সফেদ রংকা শিশিমে যো হ্যায়
উধার রাখাহো যেইঠো

খানসামা—কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ কেসা খোলতাই
দেখাতা খপসুরৎ
আয়না মে তোম এক দফে আর
দেখো আপনা সুরৎ।
(সন্তুষ্ট হয়ে জুতোর সাদা কালি মাখা মুখ নিয়ে)
বিবি—চলো তব আভি ছোড়কে আনা
খানসামা—আয় গা পিয়ার করনে রাতমে
বিবি—মোচমে আতর তব তো লাগানা
ছিপাকে চলেগা ছাতমে
খানসামা—হর্ণ বাজাতা উধার গেটমে
আগিয়া সাব্‌কা গাড়ি
জলদি চলোনা মেথর সিঁড়িসে
সামালকে চলনা শাড়ি।

তিন নম্বর দৃশ্য

(বাব্লির বাড়ির সামনের দিকের লনে ছোটো ছোটো চেয়ার পাতা। বাব্লির বাবা, মা আর রণজিৎ রায় বসে কথাবার্ত্তা বলছেন। এমন সময় বাবলি হাজির হবে)

রণজিৎ রায়। বাব্লু তোমার হয়েছে কী ?
এতো রোগা হয়ে গেছ, এ কি ?—

(রণজিৎ রায়ের দিকে চেয়ে)

বাব্লি। বহু দিন বাদে মোলাকাৎ হলো,
তুমিতো ভালই দেখি ?

(তার পর মায়ের দিকে ফিরে বলবে)

টুটুল আসার কথা যে ছিলো মা,
ও, আসবে না কি ?

বাব্লির মা। বেহারার হাতে চিঠি লিখে আমি
পাঠাবো ডাকি ?

বাব্লি। না না থাক, কিছু দরকার নাই…
শাড়ি বদলাতে ভিতরেতে যাই

(বাব্লি ড্রেসিং রুমের দিকে এগুবে)

(এবার রণজিৎ রায় বাব্লির বাবার দিকে ফিরে বলবে)

রণজিৎ রায়। টুটুলটাকে চিনতাম আমি
বিলেত থেকে—
কি আর চেহারা, মূর্চ্ছিত তবু,
মেয়েরা দেখে।

বাব্লির বাবা। ছেলেটি কেমন, করতো কি গিয়ে ?

রণজিৎ রায়। এই, পার্টিতে পার্টিতে মেয়েদের নিয়ে
হুল্লোড় কোরে উড়াতো যে টাকা…

(বাব্লির মাকে বলবার জন্যে বাব্লির বাবা রণজিৎকে অনুরোধ করলেন, তার পর বাব্লির মাকে দেখিয়ে বলবেন)

বাব্‌লির বাবা। বলুন এঁকে।

রণজিৎ রায়। যুদ্ধে, পয়সা বুঝি বা কোরেছে বেজায়?

বাব্‌লির মা। দান করে শুনি যখনি যে যায়।

বাব্‌লির বাবা। বাপের টাকাও পেয়েছে বহুৎ
বলেন কেন?

রণজিৎ রায়। গানটা না হয় গায় যে ভালো,
ঐ তো চেহারা, রংটা কালো—
তাই নিয়ে দেখি মেয়ে-মহলেতে
যুদ্ধ যেন!

বাব্‌লির মা। টুটুলের নামে বললে বাব্‌লি
বসবে বেঁকে।

বাব্‌লির বাবা। বাব্‌লিকে নিয়ে এসো না একটু
সিনেমা দেখে?

বাব্‌লির মা। দিল্লিতে তুমি রয়েছো এখনো,
সেই তো কাজে?

রণজিৎ রায়। আসুন না কেন আমার ওখানে—
শীতের মাঝে।
শীতটা ওখানে ভালই যে কাটে,
রাজা মহারাজা আর বড়লাটে—
গম্ গম্ করে সারাটা শহর
নতুন সাজে।

(এমন সময় বাব্‌লি ঘরে ঢুক্‌লে বাব্‌লিকে বাব্‌লির মা বললেন)

বাব্‌লির মা। ওকে, গান একখানা শুনিয়ে দাওনা

বাব্‌লির বাবা। ড্রইংরুমেতে বসগে যাও না

বাব্‌লির মা ঐ তো এলা এসে গেছে দেখি—

(নিজের মেয়ের চেয়ে পাছে এলাকে রণজিৎ রায়ের বেশি পছন্দ হয়ে যায় তাই রণজিৎ রায়ের কাণের কাছে মুখটা এনে চুপি চুপি)

মেয়েটা বাজে।

(এলা গাড়ি থেকে নেমে লনে এগিয়ে এসে বাব্‌লির মার কাছে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বললে)

এলা। মাসিমা, বাব্‌লি আছে কোথায় ?

বাব্‌লির মা। এলা, ইনি হচ্ছেন রণজিৎ রায়—

(এলার দিকে ফিরে এলার গুণাবলীর পরিচয় দিতে গিয়ে)

চেহারা যেমন, ভালো নাচে তায়।

রণজিৎ রায়। বাঃ, বরাত ভালো
নমস্কার যে ওনার প্রতি…

এলা। নাম আপনার—
চেনা চেনা অতি।

রণজিৎ রায়। নাচ কি একটা দেখার সুযোগ…

(বেয়ারার উদ্দেশ্যে)

বাব্‌লির মা। বাত্‌তি জ্বালো।

রণজিৎ রায়। বরাত ভালো।

এলা। বাব্‌লু তুই যে এতো সেজে গুজে ?

বাব্‌লি। আন্‌তে চলেছি বরটারে খুঁজে—

এলা। 'কাছে আছে সে যে দেখিতে না পাস'
—বৃথাই দূরে।
মিছে মায়ামৃগ পিছে ছুটে মরা
কিছুতেই সে যে দেবে না গো ধরা
তুই গান গা, আমি নাচি চল,
লাভ কি ঘুরে ?

রণজিৎ রায়। একটুকু নাচ, একখানি গান,
তৃষিত চোখেতে চেয়ে আছে প্রাণ।

এলা। সৌভাগ্যটা সে তো আমাদের।

রণজিৎ রায়। চলুন তবে।

বাব্লি। ড্রইংরুমেতে বসিগে চলুন

এলা। বিলিতি কি দিশি যে নাচ বলুন

রণজিৎ রায়। 'ট্যাঙ্গো'র পরে তাণ্ডব হবে ?

এলা। তবে, বলুন কবে—

এবারে এখন শুভ দিনটার,

সত্যি বলুন দেরি কত আর ?—

(বাব্লির দিকে ফিরে)

বিয়ের আগেই মধুচন্দ্রের

গানটা গানা।

নাচবো জানিস্ খুব ভালো কোরে

গান গাস তুই যেন প্রাণ ভ'রে

(রণজিৎ রায়ের দিকে চেয়ে)

শুভদৃষ্টিটা পাকা হোলো বোলে

যাবে কি জানা ?

(আবার বাব্লির দিকে ফিরে)

শুরু কর তুই বাব্লি আগে

বাব্লি। কোন্ সুরে গাবো গান ?

এলা। মিলন-মধুর অপরূপ রাগে

যাহা চায় তোর প্রাণ।

বাব্লি। (গান)

বেলুনের মত বহু-বাসনায়

আকাশ 'পরে—

ফেটে যায় যাক ফুস্‌ফুস্ মোর

আবেগ ভরে।

চলিতে চাহি নিরুদ্দেশে—

শুতোটি ছিঁড়ে শূন্যে ভেসে,

অজানা কোন অচিন দেশে,





কাহার তরে ?—
ফাটিয়া আমি শতধা হব,
মাটিতে চুপে চুপ্ সে রব
তখন তুমি রাখিও চুমি'
বঁধুয়া মোরে বুকের পরে।
বেলুনের মত বহু-বাসনায়
আকাশ 'পরে
ফেটে যায় যাক ফুস্‌ফুস্ মোর
আবেগ ভরে।

চার নম্বর দৃশ্য

(টুটুলের বাড়ি। ছ' সাতটা বড় বড় গাড়ি নানা রংয়ের আর ঢংয়ের এসে হাজির। গাড়িগুলোর ভিতরে বহু ছেলেমেয়ে বোঝাই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বা মোটরের হর্ণ বাজাচ্ছে, কেউ কেউ বা নেমে বারান্দায় এসে বোসেছে, কেউ কেউ বা উপরে উঠে সটান্ টুটুল যেখানে ইজিচেয়ারে এলিয়ে ছিল, সেইখানে এসে হাজির)

লিলি। টুটুল! টুটুল।

মিলি। কোরেছ কি ভুল ?—

এলা। আজকে লেকের পার্টি।।।

টুটুল। ধরেছে যে মাথা,
বুকে বাজে ব্যথা—

শিলা। সব দেখি হয় মাটি।

মায়াদেবী। কুইনিন খাও ব্র্যাণ্ডির সাথে।

বীণা। মাফ্‌লার নিয়ে নাও।

শিলা। যাই হোক তবু যেতেই হবে যে—

বেলা। নয়তো বা মাথা খাও।

টুটুল। মেজাজ নেই আজকে মোটেই
তার চাইতে তোমরা গিয়ে···
মিলি। রাজা বাদ দিয়ে পার্টি জমে কভু,
মণ্টু। রাণীদের খালি নিয়ে ?
মায়াদেবী। বাক্ আপ্ টুটুল,
(দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বয়কেই ডেকে)
শিলা। এই বয় ইধার আও।
মায়াদেবী। সাব্‌কা ওয়াস্তে ব্র্যাণ্ডি ইধার
জল্‌দি সে আভি লাও।
টুটুল। নেহাৎ দেখছি যেতেই হবে যে···
লিলি। সাধিয়ে চাচ্ছো নিতে ?
শিলা। তোমাকেই আগে লেকের জলেতে
চোবাবো আমরা শীতে।
লিলি। উহু—উহু—টুটুল, টুটুল।
মিলি। যাচ্ছো কি ভুলে সুইমিং পুল্।
শিলা। কাটবো সাঁতার সবাই মিলে—
বেলা। কোথায় কোকিল কুহু—কুহু—
বীণা। আমরা শীতে উহু উহু—
মণ্টু। জমবে তোমায় সঙ্গে নিলে।
টুটুল। যাচ্ছি চলো, ওঠা যাক তবে—
তোমরা আগে এগোও না সবে।
মেয়েরা সবাই। তা কি হয়, তা কি হয়,
মায়াদেবী। পাছে না-আসো রয়েছে যে ভয়।
লিলি। তোমার সঙ্গ উত্তেজনার আগুনে
বেলা। আমরা ডেকে
এলা। আনবো লেকে
মিলি। পৌষের রাতে ফুলদোলের ঐ ফাগুনে



পাঁচ নম্বর দৃশ্য

(টুটুলের গাড়িতে লিলি আর টুটুল। শীতের জ্যোৎস্না রাত, টুটুলের মুখে লিলির ভাঙা চুলগুলো আছড়ে পড়ছে। টুটুল জ্যোৎস্না-ধোয়া লিলির মুখে দিকে চাইলো, উদাস গভীর সে চাহনি)

লিলি। গান গাও, ওগো গান গাও—
কি জানি যে কারে কি জিনিষ তুমি চাও
অমন কোরে চেয়ে আছো কেন বলো ?
স্পিড দাও আরো আরো জেরে চল—চল—

টুটুল। চলি যেন ভয়,

লিলি। অতিশয় ভয় ভয়,

টুটুল। দেখ, চাঁদের আলোয় চিক্ চিক্ করে
চারিধারে লেকময়।

লিলি। নারকেল গাছ ঝির ঝির করে ··

টুটুল। কি জানি এ-রাত কাহাদের তরে।
ভুলে যাই শীতকাল।

লিলি। ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে নাও
কোথায় গেল যে শাল ?

টুটুল। মদ না খেয়েই হয়েছি আজকে
জ্যোৎস্নায় চুরচুরে···

লিলি। তেপান্তরের প্রান্তর ছেড়ে
যেতে চাই আরো দূরে।

টুটুল। অরূপ দেশের রূপকের মত···

লিলি। অপরূপ রাত এই।

(টুটুল উঁচুতে আকাশের দিকে চেয়ে)

টুটুল। রাজকন্যা গো!
শুধু তুমি নেই—তুমি নেই।

লিলি। রাজপুত্র যে—সে তো জানি আছে, আছে···
তুমি যে বোসে গো রয়েছ আমার
নিবিড়তম সে কাছে।

(টুটুলের গাড়িটা লেকের একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে চানাচুরওয়ালারা, ম্যাগ্‌নোলিয়া আইসক্রিম-ওয়ালারা যে যার নিজের জিনিষ বেচবার জন্তে ওদের গাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে)

মেঠাইওয়ালা। মেম্‌সাব,
মণ্ডা-মিঠাই চিনি কি ত্যরা সে···

ম্যাগনোলিয়া। বড়াসাব,
আইসক্রিম হ্যায় মালাই ভরা সে···

চানাচুরওয়ালা। চানাচুর্‌ চুর্‌মুর্‌।

লিলি। ভাগো ভাগো, দূর—দূর।

ম্যাগনোলিয়া। দেশী চিজ্‌ সাব, খানেমে মরা সে।

মেঠাইওয়ালা। আরে কেয়া বাত্‌—স্বদেশী চিজ!
বিবিনে ব্যনায়া হাত্‌সে নিজ।

লিলি। বক্‌ বক্‌ তোম মত করো।

(চানাচুরওয়ালা একটা ছোটো ঠোঙায় ভরা চানাচুর এগিয়ে দিয়ে কাকুতি কোরে)

চানাচুরওয়ালা। এসাই হুজুর থোড়াসে ধরো।

লিলি। করে কিল্‌বিল কলেরা বীজ
খেও না, খেও না, মারাই যাবে যে—
নোংরা তেলেতে আনে ওরা ভেজে,
—বিক্রি করে যে সব।

টুটুল। আভি ভাগ যাও তব।

(গাড়ি থেকে নামতে নামতে লিলির দিকে ফিরে)

পায়চারি চলো করি গো নেবে যে।

(দইবড়াওয়ালা ওদিক থেকে গান গাইতে গাইতে গাইতে মোটরের সামনে তার বোঝা নামিয়ে)

দইবড়াওয়ালা। বহুৎ বড়িয়া দহি কি বড়ে হ্যায়
মটর মুট্ মুট্ ভাজা—

লিলি। ম্যাগনোলিয়ার আইসক্রিম খাও…

ম্যাগনোলিয়া। বিলাইতি চিজ্ তাজা।

(লিলি টুটুলকে ম্যাগনোলিয়ার আইসক্রিম খেতে বলায় চানাচুরওয়ালা রেগে গিয়ে)

চানাচুরওয়ালা। ঝুট্ মুট এ-লোক স্বদেশী বোলতা—

মিঠাইওয়ালা। মগর বিলাইতি চিজ খাতা।

দইবড়াওয়ালা। অগর দেশমে যাকে ক্ষেতি করনে…

চানাচুরওয়ালা। রুপেয়া কুছ তো আতা!

মিঠাইওয়ালা। আজব শহর কলকাত্তা এ

দইবড়াওয়ালা। মু'মে বোলতা বাত্…

চানাচুরওয়ালা। কাম্‌মে কর্‌তা আউর্ এক্ চিজ্,

ঘুঘনিওয়ালা। চল্‌না মুস্কিল সাথ।

(ওদিক থেকে মিলি বেলা শিলা ইত্যাদি কয়েকটি মেয়ে সুইমিং পুলে না গিয়ে লেকের পথের পাশে ঘাস-বিছানো ফালি জমি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রোইং ক্লাবের ক'টা নৌকা বাঁধা দেখে)

মিলি। নৌকোগুলো যে নেওয়া যাক চলো—

বেলা। রোইং ক্লাবেতে যাই।

(সবাই নৌকগুলোর কাছে এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে)

(গান)

সবাই 'মায়ামী' তীরের মায়াবিনী মেয়ে
মনে হয় মোরা—ভাই।
মরমী চাঁদ মরিছে মুখে—
'রুম্বা' নৃত্য রুধিরে রুখে।
হেইও হাই—হেইও হাই—
ওঠো নৌকোয় টানগো দাঁড়,

(সবাই মিলে নৌকায় উঠে দাঁড় গুলো ধরে)

অকূলের পানে তরীরে ছাড়,
হেইও হাই—হেইও হাই—
কূলের কথায় ভুলে যাই চল্
চারিধারে খালি জল আর জল
ভরা ডুবি হোতে চাই—
হেইও হাই—হেইও হাই।—

(এদিকে টুটুল আর লিলি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে দেখা যাবে)

টুটুল। চলো এইবার স্যুইমিং পুলে,

লিলি। হয়েছে হাঁটা ?

টুটুল। দেখবো কেমন জলপরীদের সাঁতার কাটা।

লিলি। জানিনে আমি সাঁতার কাটতে, ডোবাতে চাও ?

টুটুল। তুচ্ছ এ-লেক সাগরে ডুবলে ওঠাবো তাও।
গান গাবো আমি বসিয়া এপারে

লিলি। জলকেলি তবে চলিবে ওপারে ?

টুটুল। যেখানে বসিয়া রয়েছি যেথা
একাকী আমি রহিবো সেথা—
লীলা-উচ্ছল চঞ্চলাদের এ-ধারে।

(কয়েকটি মেয়ে তখন স্যুইমিং পুলে নেমে জল ছোঁড়াছুড়ি লাফালাফি কোরে, মুখর কোরে তুলেছে সেখানকার চারিপাশ। স্যুইমিং পুলের ধারে মায়াদেবী প্রমুখ আর কয়েকটি মেয়ে তখন দাঁড়িয়ে, এমন সময় টুটুল তাদের মধ্যে হাজির হয়ে গান জুড়ে দিলো)

গান

কি অপরূপ মরি মরি
জলপরীরে জলপরী।
লাবণ্যতে লেকের জল—
তরঙ্গিয়া হোল পাগল।





বাহুর মাঝে রাহুর মত আড়াল করি—
বুকের পরে লুকোচুরি খেলছে ধরি।
শরীরময় জলের ফোঁটা
মুক্তো যেন পুষ্প ফোটা
আলোর যেন ঝালরগুলো ঝুলছে জরি
কি অপরূপ মরি মরি
জলপরীরে জলপরী।

মন্টু। নেমে এসো জলে টুটুল ওহে—
শিলা। লাভ কি ডাঙায় বসিয়া রোহে ?
বেলা। লাফিয়ে পড় লাফিয়ে পড়···
এলা। সময় কেন নষ্ট কর ?
লিলি। ফিরবে বাড়ি তপ্ত তাজা হোয়ে।

(টুটুল জলে না নামার দরুন মেয়েরা রেগে গিয়ে টুটুলকে উদ্দেশ কোরে বলবে)

শিলা। জানি ইলা ইলা ইলা, ইলাই সব।
বেলা। আমরা কিছুই নই কি ?
এলা। বুঝেও বোঝ না বোকারাম অতি
লিলি। আমরা পেত্নি বই কি ?
টুটুল। মনেতে নামে বর্ষা যেন—
মন্টু। মিইয়ে গেছো কি জানি কেন ?
মিলি। ইলার কথা পড়ছে বুঝি মনে ?
টুটুল। বলেছে ইলা দেখার মত--
দেখতে দেশের কীর্ত্তি যত।
মায়াদেবী। তবে, যাও না কেন সেবাগ্রামে,
এলা। বদ্দিনাথে কাশীধামে,
বেলা। অথবা কেন শান্তিনিকেতনে—

(টুটুলকে উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে)

বীণা। বলছি ভালো,
না গিয়ে দূরে
মিলি। ধানবাদে কি হায়দ্রাবাদে অজান্তায়,
মায়াদেবী। কোলকাতারি কোণে কোণে···
শিলা। দেখনা কেন এই নগরীর···
এলা। আজব ঘরের আজগুবি সব নাজাস্তায়।
লিলি। আছে বটানিক্স্ ভিক্টোরিয়া,
এলা। পিক্‌নিক্ চলো করা যাবে গিয়া
বকু। জু গার্ডেন গেলে—
বাঘ ভাল্লুক কতো।
মায়াদেবী। পয়সা ফেলে কষ্ট কেনায়
বাহাদুরি কিবা অতো ?
মিলি। আমাদের নিয়ে যাবে কি বেড়াতে ?
বীণা। বেঁচে যায় জানি পারলে এড়াতে—
বেলা। ভুলে যাস কেন হৃৎ···
এলা। টুটুলের ঘাড়ে আপাতত জানি···
শিলা। চেপেছে ইলার ভূত।
মায়াদেবী। দেশ দেশ কোরে মেয়েগুলো সব
গেল গোল্লার দ্বারে।
বীণা। আকর্ষণের আদত কেন্দ্র
গেঁথেছে টুটুলটারে।
শিলা। যাও তুমি যাও—আমাদের এই
মিলি। এসো না দলে।
বেলা। যেও, ডুবে যেও, উল্টোডিঙির
খালের জলে।
বীণা। বাছাই করা সমাজে বর্জ্জি
টালিগঞ্জ টালা যেথায় মর্জ্জি



লোফারের মত খালের ওপারে
চটের কলে…

মায়াদেবী। যেথা খুসী যাও, বাঁচো আর মরো
ইলার পিছনে ঘুর ঘুর করো,
চুলোয় যাওগে খোলার বস্তি
পাঁকের তলে।

ছ' নম্বর দৃশ্য

(টুটুলের ড্রয়িংরুম। ও'র উদাস উস্ক-খুস্কো চেহারা। টুটুল অর্দ্ধেক শোয়া অর্দ্ধেক বসা ভাবে এলিয়ে আছে একটা কউচে। সামনে বোসে সঞ্জয় সোম। কফির পেয়ালা পিরীচ পাত্রগুলো একটা গোল টেবিলে সাজানো। দুটো কফির পেয়ালা দু'জনকার সামনে, যা থেকে ধূমায়িত কফি দেখা যাচ্ছে)

টুটুল। ভালো লাগে না,
কিছুই লাগে না ভালো—
ঘুরে আসি কিছুদিন।
—কোথায় বেহারা!
এই খানসামা,
কাঁহা হ্যায় রামদীন?

(খানসামা সেলাম দিয়ে এসে দাঁড়াবে)

খানসামা। হাজির হ্যায়।

টুটুল। বাহার হাম্‌নে, কাল যানা চায়—
বোলাও নোকর, নিকালনে বলো,
হোল্ডল স্যুটকেশ।
(নিজের মনে)
পানসে মেরেছে সিনেমাগুলোয়

সঞ্জয়। কালকে যে আছে রেস্।

টুটুল। মনে হয় সব বিলকুল বাজে
বাড়ি গাড়ি বাহাদুরি—
ফট্‌কা বাজার পট্‌কে যাক্‌গে,
মেয়ে আর মন চুরি।

সাত নম্বর দৃশ্য

(ষ্টেসনে টুটুল এসেছে। একটা ক্যামেরা ঝোলানো কাঁধে। মুখে পাইপ, সঙ্গে মাত্র রামদীন চাকর। ও' বন্ধুবান্ধবীদের কাউকে খবর না দেওয়ায় 'সি অফ' করতে কেউ-ই আসে নি। ট্রেনের ঘণ্টা বেজে গেছে। ওর নিজের জিনিষগুলো গোছ-গাছ করতে করতে গুন্‌গুন্ করতে সুরু করেছে।)

(গান)

ইলা।

আমার নয়ন-ভোলানো নীলা—
বুদ্ধি-দীপ্ত গভীর হৃদয়-তীরে,
মণির মতন উজ্জ্বল অতি
তুমি, কঠিন প্রখর হীরে।
আমারে কাটিয়া তারি খরধারে
খান্ খান্ করি মিছে বারে বারে
জানিনাকো তুমি কী মজা পাও ?
ধুলায় লুটায় আমার গর্ব।
তোমারে তুলিয়া দিলাম সর্ব—
এবারে যে ওগো আমারে নাও।
ইলা।
শুনিলে না তবু, প্রাণহীন যেন—
বধির পাষাণ-শিলা।

মায়ামৃগ

(চলতি ট্রেনের জানলার ধার দিয়ে কলকাতার শেষপ্রান্ত মিলিয়ে আসা মিলগুলো আর সহরতলীর দিকে দৃষ্টিটাকে উদাসভাবে ছিটিয়ে টুটুল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে)

অতুলনীয় যে এই কলকাতা
তুলনা তাহার নাই।
কিছু নাই তবু পিছু ডাকে মনে
যেন, সব কিছু হেথা পাই।

আট নম্বর দৃশ্য

(টুটুল ফিরে এসেছে নানা দেশ ঘুরে। কলকাতায় সন্ধ্যে বেলায় ওর বাড়ির বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে ওর প্রিয় গ্রেট ডেনটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে গান গাইছিল)

(গান)

যেখানে যাই শূন্যতাই
কোথাও সে যে নাই।
যাহারে চাই সে যেন ওরে
নাই—
ঘাটে ঘাটে কত না বাটে
চলেছি লেগে,
কখনো হেসে, ভালবেসে,
কখনো রেগে,
স্রোতের টানে সে কোনখানে
যাই—
কক্ষচ্যুত উল্কা যেন
লক্ষ্য যেন নাই।
গেলাম কত নানান্ শত
নতুন দেশে

নানান লোকে
কান্না চোখে,
কেউবা হেসে···
তাকে যে আমার চাই
চক্ষু বুজে যাহারে খুঁজে পাই—
খুললে আঁখি
পালায় পাখী
উড়ে গো চলে যায়···
মরি, হায় হায় হায় হায়!

(গানের মাঝে বেহারাটি বাধার মত এসে সেলাম করে বললে)

বেহারা। মেম্‌সাব এক আপ্‌কা সাথ করনে মাঙ্গ্‌তা মুলাকাত।

টুটুল। ড্রইং রুম্‌মে বৈঠা দেনা।

(টুটুল এবার অন্য দিকে ঘুরে খাসকামরায় নোকর কে ডাকার ঢংয়ে)

কে-ও—

(খাস কাম্‌রায় নোকর প্রবেশ করলে টুটুল এবার তার দিকে ফিরে বলল)

ড্রেসিং গাউন ইধার দেনা।

(নিচে থেকে বিরাট গুরুগম্ভীর গলায় চেনে বাঁধা গ্রেট্ ডেন্‌টা আগন্তুক দেখায় তখন ডাকতে শুরু করেছে)

গ্রেট্ ডেন্। ঘেও- ঘেও—

(টুটুল ড্রেসিং গাউনটা গায় দিতে দিতে সেই আগের অসম্পূর্ণ গানটীর কথাগুলো নিয়ে গুন গুন করবে, তার পর সেই সুর আর কথায় আত্মভোলা হয়ে নিজের অগোচরেই নেমে আসবে গাইতে গাইতে)

(গান)

ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
কাহার লাগি রজনী জাগি

মায়ামৃগ

স্বপন গাঙে নাও খানি মোর বাই
ওগো—
তোমায় কোথায় পাই ?
লিপষ্টিকে লাল
নয়কো 'লিলি'
রুজ মাখা মুখে নয়কো 'মিলি'
কিম্বা 'মায়া' 'ছায়া'
ক্রেপের শাড়ি নয়কো গাড়ি
কিম্বা শিফন শায়া
মিথ্যা ওদের 'রানি' 'বাণী'
সকল কথা তোদের জানি
কেবল অভিনয়…
দেহ মনে সকল কোনে
বেবাক মিথ্যে ময়
যাহারে চাই
যাহারে খুঁজি
তারে যে নাহি পাই।

(টুটুল আসতে আসতে সিঁড়ি ভেঙে নেমে ড্রইং রুমে যখন হাজির তখন ইলাকে ড্রইং রুমে বসে থাকতে দেখে একটু থতমত খেয়ে অবাক হয়ে ইলাকে বলবে)

। কার মুখ দেখে
উঠেছি যে আজ
সকালে সেকি
ভাগ্য আমার!
আশাতীত তুমি
আসলে একি?

ইলা। এসেছি বলে কি অবাক হলে কি তোমার কাছেতে
আজ—
দেশের কাজেতে ফেলেছি আমার সকল গর্ব্ব লাজ।

টুটুল। শুনিতে চাহি না আবেদন কিছু, তুমি বলবার আগে…
ফতুর হয়েও যা আছে বেবাকি দেব যা তোমার
লাগে।

ইলা। অনাহুত আমি এলাম আজকে অর্থের দরকার।
তোমার কাছেতে চাঁদা চাই কিছু, অথবা যে
কিছু ধার…

(এমন সময় খাস কামরার নোকরের পুনশ্চ অকস্মাৎ প্রবেশ হতে টুটুল বললে)

ব্যাঙ্ককা কিতাব আলমারি সে
(আলমারির চাবিটা চাকরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে)
নিকাল লাও
দেরি না-করো, তুরন্ত আভ্ ভি—
জল্দি যাও।

(চাকর চলে যেতে তারপর আবার ইলার দিকে ফিরলে ইলা টুটুলকে বলল)

ইলা। কতনা অর্থ গেছে অনর্থে পরার্থে দানকরি…



টুটুল। তোমার কাজেতে যদি কিছু লাগি
সম্মান বলে ধরি।

কিন্তু, আজকে নিছক্ নিজের স্বার্থে
তোমারে যে দিতে চাই-
তোমার খাতায় সই করে চাঁদা
দিলাম জীবনটাই।

ইলা। আমি তো ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র তা' থেকে
ভিক্ষাপাত্রখানি



ভয় হয় পাছে এত বড় দান…
ধরিবে না তায় জানি !
কত বড় লোক রয়েছে কত যে,
তোমারে বুকেতে মণির মত যে
রাখিবে ধন্য হয়ে !…

টুটুল। আমি কি তুচ্ছ, এত কি বাজে ?
কোহিনুর যাহা মুকুটে রাজে
সাধিয়া দিলাম ল'য়ে,
ফেলে দিলে তুমি খেলার ছলেতে,
হেলায় ফিরিয়ে দিলে
সোনা ফেলে শুধু শূন্য আঁচলে
গেরোখানি তুলে নিলে !

ইলা। রেগো না টুটুল, তুমি ঝুটমুট্,
হীরের লাগিয়া সোনার মুকুট !
ইস্পাতময় ইলা তা নিয়ে—
করিবে কি ?

টুটুল। তাই ভাল তবে তাই ভাল
কলঙ্ক নয়—
অলঙ্কারের মত সে দাগটি কালো,
আমার জীবনে রহিলে যে তুমি
তুমিই প্রথমতমা
অবহেলা ক'রে আমার প্রেমেরে
পেল যে প্রথম ক্ষমা !

ইলা। নিত্য দিনের কাজে লাগে যাহা
সেইটুকু শুধু চাই আমি তাহা—
লোহার হাতুড়ি হীরে নিয়ে হায়
করিবে কি ?

(এমন সময় খাস কামরার চাকর চেক বই নিয়ে আসতে ইলার নাম চেকে লিখে টুটুল বলবে)

টুটুল। দিলাম তোমায় ব্ল্যাঙ্ক চেক্ এই
যাহা খুসি প্রাণ চায়—
অনুরোধ শুধু
নিজে হাতে লিখো,
যা আছে অঙ্ক তায়।

ন' নম্বর দৃশ্য

(ইলার ভাঙাচোরা ঘর। নানা কাগজ পত্র, ফাইল ইত্যাদি নানাদিকে ছড়ানো। ছোট ফোল্ডিং খাট একটা একধারে, আর একপাশে ছোট একটা টেবিল। দেওয়ালের একপাশে শৃঙ্খলিত ভারতের একটা ছবি আর এক ধারে ভারতবর্ষের বিরাট একটা দেওয়াল জোড়া ম্যাপ। ইলার উস্কখুস্কো চুল, সকাল বেলা সবে ঘুমভাঙা অবস্থা, বেশভূষা একটু এলোমেলো কিন্তু তার মধ্যে থেকেও ওর ক্ষুরধার তরবারির মত চেহারা উদ্ধত ভঙ্গিতে যেন প্রকাশিত। ও' ভারতবর্ষের ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইছে)

গান :

স্বদেশ আমার স্বদেশ আমার তুই
শপথ করি ও' তোর রাঙা চরণ দুটি ছুঁই।
আমার জীবন এ-দেহ মোর
অর্ঘ দিলাম চরণে তোর
নমঃ নমঃ নমঃ নমহে নমঃ চরণতলে মুই।



স্বদেশ আমার স্বদেশ আমার মাগো,
শত শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া রুদ্রাণি রূপে জাগো।
ভালবাসা প্রেম ভাসান দিয়া—
একটি মন্ত্র তুলেছি নিয়া।

দেশের সেবায় যেখানে যে আছে সকলে মিলিয়া
লাগো!
—ঘুমায়ো না বৃথা শুই।
নমঃ নমঃ নমঃ নমহে নমঃ চরণে মা তোর নুই।

প্রতাপ। ইলাদি,

ইলা। কে?

প্রতাপ। আমি প্রতাপ। টাকা কিছু জোগাড় হোলো? দুর্ভিক্ষের কাজ তা নইলে সবতো বন্ধ হয় হয়।

ইলা—হয়েছে জোগাড় (চেক্‌টা ব্যাগ থেকে বের কোরে টেবিলে রেখে)

প্রতাপ। কে দিলো, কে?

ইলা। টুটুল।

প্রতাপ। য়্যাঁ, টুটুল! সে দিলো টাকা দেশের কাজে! মেয়ে মহলে এর চারডবল টাকা ওর বরবাদ হোলেও অবাক হবার কিছু ছিলো না। কিন্তু ইলাদি আপনি আশ্চর্য্য লোক! শেষ অবধি আপনি দেখচি অসম্ভবকে সম্ভব কোরতে পারেন। দেশের কাজে টুটুল দিল টাকা!

ইলা। শুধুই কি এই? তুলে দিতে চেয়েছিলো তার জীবনটাও আমার হাতে।

প্রতাপ। তারপর!

ইলা। যা অনাবশ্যক তা যতো লোভনীয় হোক ইলার কাছে তা আবর্জ্জনা।

প্রতাপ। তারপর!

ইলা। ধনীর বিলাসী জীবন লাগবে আমার কি প্রয়োজনে?

প্রতাপ। টুটুলের এই ব্ল্যাঙ্ক চেক্‌টা প্রতিবাদ কোরছে

কিন্তু আপনার কথা! ঐ দেখুন কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে আপনার মুখের পানে তাকিয়ে আছে ওটা। আপনার অকৃতজ্ঞ উক্তিতে যেন গেছে একদম হতবাক হয়ে। জীবনে অপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ আছে ইলাদি, যা নিত্য প্রয়োজনের অনেক উর্দ্ধে। সকলের সকল অস্বীকারের মধ্যে যার স্বীকৃতি। ঝড়ের আগমনীর মত হয় যার অকস্মাৎ আবির্ভাব, যাকে এড়ানো চলে, কিন্তু···

ইলা। তারা আদর্শের পথে সাজ্ঘাতিক। আনে সর্ব্বনাশ। ব্ল্যাঙ্ক চেকটা দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে টুটুল, টাকার ঘরটায় যা খুশী তাই যেন দয়া করে বসিয়ে নিই। টাকার গরম! সব সহ্য হয়, কিন্তু যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ-বড়লোকদের ভদ্রতার ভান আর বিনয়ের বোরখা ঢাকা এই দাক্ষিণ্য···আমার গাটা জ্বলে ওঠে। যাই হোক, এখন তুমি কি আনলে বল প্রতাপ ?

প্রতাপ। আপনার আনা ঐ চেকের তুলনায় নেহাৎ-ই তুচ্ছ—মাত্র চুরানব্বুইটা টাকা—দিলুম গোল্ড স্টাডার্ড অফ্ কোরে—শেষ-সম্বল সোনার বোতামগুলো!

ইলা। তার চেয়ে যে আমার অনেক বেশী দাবী।

প্রতাপ। কিছুই যে আমার নেই আর ইলাদি।

ইলা। তবু চাইছি, পারবে না দিতে ?

প্রতাপ। আমি তো দিয়েছি, দিয়েছি তো ইলাদি, অনেক আগেই তো দিয়েছি নিজেকে বিলিয়ে আপনার কাজে।

ইলা। আমার কাজ! বুঝলুম আমার কাজ আজো তা হোলে তোমার কাজ হয়ে ওঠেনি প্রতাপ। দেশের কাজ সে কি শুধু আমারি!

প্রতাপ। আমি তো নিবেদন করেছি আপনার কাছে নিজেকে।

ইলা। নিবেদনের গ্যাকামী চাইনে, মেয়েলী আবেদনও নয়, চাই চাই সেই উদ্ধত 'আমি' কে—যে 'আমি' বিদীর্ণ কোরবে দেশের সকল গ্লানিময় অন্ধকূপ। যে 'আমি' দেশের পরাধীনতার সহস্র শৃঙ্খল পদদলিত কোরে ধরণীকে ধ্বনিত কোরে বোলবে, আনবো আমি স্বাধীনতা, ফিরিয়ে আনবো আমি জন্মভূমির আজন্ম অধিকার। তার সকল দৈন্য সকল দারিদ্র্য দূর কোরে তাকে বসাবো পুনরায় মহিমামণ্ডিত গৌরবের রথে। চলন্ত সে রথ, প্রশংসায় সে পথে ধূলিকণাও হবে জ্বলন্ত।

সব নিবেদন আবেদন অগ্রাহ্য কোরে আমি সেই অহংকে তোমার মধ্যে আবিষ্কার কোরতে চাই প্রতাপ। বলো বলো প্রতাপ, দেশের কাজ আমার মত তোমারও আদর্শ—একমাত্র আদর্শ। চলো চলো বোঁচকাটা পিটে বেঁধে নাও, কম্বলটা দাও, বেরিয়ে পড়তে হবে এখুনি। ট্রেনের সময় হোয়ে এলো।

প্রতাপ। এখুনি কোথায়?

ইলা। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম। চালের দাম চড়ে চলেছে আরো আরো, কাতারে কাতারে লোকের করুণ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছো না। আকাশ ফাটিয়ে ফেলছে, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। দলে দলে উলঙ্গ নরনারী দুর্গত দুর্ভিক্ষগ্রস্থরা শহরে ঠেলে আসছে। ঝড়ে উড়ে গেছে তাদের ঘর, প্লাবনে ভেসে গেছে তাদের গ্রাম, চাষের জমি চলে গেছে মাহাজনের হাতে, এক মুঠো অন্ন—তারও কোন উপায় নেই।

(চলার পথে ইলাকে বাধা দিয়ে প্রতাপ বল্লে)

প্রতাপ। কিন্তু টুটুলের চেক্‌টা ভাঙানো হলো না যে—টাকার···

ইলা। টুটুলের টাকা নেবোনা স্থির কোরেছি। ভেবে দেখেছি, আমি ও-চেক ভাঙাতে পারি না প্রতাপ। ও-টাকা টুটুল আমার আদর্শের উদ্দেশ্যে দান করেনি, দিয়েছিল আমাকে।

(ইলা চেক্‌টা ছিঁড়ে কুটি কুটি কোরে ফেল্লে)

প্রতাপ। এই নিন ইলাদি, রাখুন এটা তা হোলে আপনার কাছে, নয়তো হারিয়ে ফেললে···

(প্রতাপের সেই চুরানব্বই টাকাটা ইলা প্রতাপের হাত থেকে নিয়ে)

ইলা। গ্রহণ কোরলুম। এর মধ্যে আত্মগোপন কোরে আছে তোমার আত্মা! তোমার সঙ্গে যে আমার আত্মার আত্মীয়তা প্রতাপ। আগুণের সঙ্গে আগুণের যে সম্পর্ক তাই!—তুমি যে আমার ভাই।

(ইলা আর প্রতাপ বেরিয়ে যাবার সময় সামনের ঘরে কাজে ব্যস্ত বসে থাকা অজয় বলে একটি ছেলে ওদের বেরিয়ে যেতে দেখে বললে)

অজয়। কবে আসছেন ইলাদি?

ইলা। মাসখানেক লাগবে। প্রতাপও আমার সঙ্গে যাচ্ছে। মণীন্দ্রকে বোলো আমার অবর্তমানে এই কটা দিন এখানকার কাজগুলো সবিতার সহযোগিতায় ও' যেন নিত্যকার মত কোরে চলে। ও'দের উপর আমার বিশ্বাস আছে। দেখো, কাজে যেন কোনো অবহেলা না হয়।

অজয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

(ইলা আর প্রতাপ বেরিয়ে যাবে)

দশ নম্বর দৃশ্য

(টুটুলের বাড়ী। সন্ধ্যা হয়ে গেছে—অস্থির পদক্ষেপে বারান্দায় পায়চারি কোরতে কোরতে টুটুল গান গাইছে)

(গান)

শান্তি নেই,
কোন কিছুতেই—
অশান্ত মরুর ঝড় শুধু
তৃণহীণ তেতে ওঠা যেন বালি ধূধূ
জীবন আমার!
বারে বার
যারে—
দিয়েছি ছড়িয়ে!
দুহাতে উড়িয়ে চারিধারে
চলি তারে
পিশে পায় পায়।

জীবনে শ্রেষ্ঠ দিনগুলো,
হয়ে যায় চূর্ণীভূত ধূলো···

আমার জীবন নিয়ে—
ব্যর্থতা সে বিরাট বিপুল
রূপ তার পাক।

—শুধু সেই!
আর সব
হারায় ফেলেছে তার
খেই···

(হাততালি মেরে বেহারাকে ডেকে)

টুটুল। **কোই হ্যায় ?**

বেয়ারা। হুজুর হাজির ম্যায়।

টুটুল। **বাহার যায়েগা,**

রাতকা খানা উধারি খায়েগা—

বাহার করনে বোল দেও গাড়ি গেরাজ সে,

জুতি-উতি সব নিকাল্‌নে বোলো দেরাজ সে·





এগার নম্বর দৃশ্য

(টুটুল নিজের বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তখন চৌরঙ্গির ফিরপোর সামনে হাজির। তারপর ড্রেস স্যুট পরা টুটুলকে ফিরপোর সামনে গাড়িটা রেখে তরতর কোরে ফিরপোর উপর তলায় উঠে যেতে দেখা যাবে। হঠাৎ অনেকদিন বাদে টুটুলকে ফিরপোর দোতলায় দেখতে পেয়ে ওর এ-দিক ও-দিকে ছড়িয়ে বসে থাকা বন্ধুরা চিৎকার শুরু করে দিল)

সঞ্জয়। এই যে টুটুল—কোথায় গেছিলে?

রণজিৎ। হেই—

মণ্টু। ব্যাপার কি? বহুদিন দেখা নেই।

প্রশান্ত। উস্কো খুস্কো কেন?

ভুলু। অসুখের থেকে এখুনি উঠে
সটান এসেছো যেন!

টুটুল। হাওয়া বদলাতে গেছিলাম আমি
এসেছি কদিন হোলো…
তোমাদের আগে খবর কি সব বলো?

(অদূরে একটি রূপসী নজর কোরে ভুলুকে টুটুল বোললে)

আরে, মেয়েটা বলো তো কে?
চেনা চেনা লাগে মুখ!
পাউডারের ঐ পরিচিত অতি গন্ধেতে
শিরা উপশিরা উন্মনা নাচে ছন্দেতে,
উন্মাদ উন্মুখ!

মণ্টু। চিনলাম না তো·· নোতুন দেখছি আজ,

টুটুল। দেখেছি যেন বম্বেতে আমি—'ক্রিকেট ক্লাবে'
কি 'তাজ'…

(টুটুল বন্ধুদের দিকে চেয়ে)

ক্ষমা কোরো ভাই,
আলাপ করিগে যাই।

(টুটুল মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলে রঞ্জিত বলবে)



রণজিৎ। দেখলে কাণ্ডখানা!

মণ্টু। শুনবে কি আর মানা—

সঞ্জয়। চিলের মতন ছোঁ মেরে এখুনি
নিশ্চিত নেবে ও'কে…

ভুলু। ঐ জন্যেই তো টুটুলের এতো
বদনাম দেয় লোকে।

(টুটুল মেয়েটির টেবিলের সামনে এসে বলবে)

টুটুল ক্ষমা কোরবেন, বম্বেতে কি…ই…
আপনার সাথে?
'ক্রিকেট ক্লাবেতে'…
কিংবা ডিনারেতে,
অথবা কি রাতে হোটেল 'তাজমহল'…
নেচেছি, অথবা পায়চারি কোরে মেরেছি টহল—
মনে হয় যেন, সেই চেনা-চেনা…মুখ
ডরোথি লামোর—ঠিক তারি মত
লালসা-লোলুপ লুক্!

মেয়েটি। কোথায় দেখেছি বলুন তো?

টুটুল। গরম লাগছে,
ঐ টেবিলেতে চলুন তো—
ফ্যানটা রয়েছে হোথা!

মেয়েটি। খুব চিনি-চিনি মনে হয় যেন…
দেখেছি দেখেছি কোথা!

(মেয়েটি তখন উঠে দাঁড়িয়ে অন্য টেবিলের দিকে যেতে যেতে)

যাচ্ছি চলুন—

টুটুল। দেবে কী বলুন,
গিম্‌লেট, য়্যাব্‌সাঁত্?

নেশার আবেশে উত্তেজনায়
উথলি উঠুক রাত।

মেয়েটি। ব্যার্গাণ্ডি।

(মেম সাহেবের বারগাণ্ডি অর্ডার হলে পর টুটুলের অর্ডারের জন্যে দাঁড়িয়ে-থাকা বয়ের দিকে ফিরে চেয়ে টুটুল বলবে)

টুটুল। হামরা ওয়াস্তে সোডা লেয়াও
বড়া পেগ্ দেও ব্রাণ্ডি

(টুটুল এবার মেয়েটির দিকে চেয়ে)

টুটুল। আর কী হুকুম ?

মেয়েটি। ঘুমের মতন নয়নে নরম
নেশার নেমেছে চুম্ !

টুটুল। গ্রীন সাঁতারুজে—
'হারানো রতন ফিরে আসে ফের খুঁজে' !
সবুজ রংটি, টিয়ের পাখনা যেন—

মেয়েটি। তবে সাঁতরুজ নেই কেনো ?

(মেয়েটি বারগাণ্ডি ভরা লিকিওর গ্লাসটি এবার চোখের সাম্নাসাম্নি তুলে ধরে আপন মনে বলবে)

মেয়েটি। লিকিওর গ্লাস ঠুন্‌কো কাঁচের
লিক্‌-লিকে সরু কত ?

টুটুল। মনে হয় যেন আপনার সরু
শরীর খানির মত !
—ভঙ্গীতে যার সঙ্গীত ভরে
জাগে,
নাগিনীর ন্যায় রাগিনী যত !

মেয়েটি। হাসালেন।

টুটুল। ভালো-বাসালেন।

(এমন সময় বয় সেলাম দিয়ে একটুকরো কাগজ টুটুলের হাতে দিলো)

বয়। সাব্‌নে আপ্‌কা সেলাম দিয়া—

টুটুল। আব্‌ভি যাতা—বোল-না যাকর।

(মেয়েটির দিকে ফিরে)

অজানা দেবী—নাম না জানা,

আপনার এই অধম চাকর

মিনিট কয়েক চাচ্ছে ছুটি,

এখুনি ঘুরে আসব ছুটি'

—আসছি হেথা

হৃদয় খানি রাখিয়া গেলাম জিম্মা যেথা।

মেয়েটি। নিশ্চই যান—

আসুন ঘুরে মধ্যে এরি···

দেখবেন যেন না-হয় দেরী।

(টুটুল—কিছুক্ষণ বাদে নিজের টেবিলে ফিবে এসে দেখবে মেয়েটি নেই, তারপর মেয়েটিকে না দেখতে পেয়ে আপন মনে বলবে)

টুটুল। কোথায় গেল—চলে গেল নাকি ?

বয়টাকে গিয়ে শুধাই ডাকি—

(নিজের টেবলের বয়টার দিকে চেয়ে)

মেমসাব এক বয়ঠ্‌কে হিঁয়া ?···

বয়। মেমসাব ওতো চলানে গিয়া।

(টুটুল বয়ের শেষ কথাটা অর্থাৎ 'চলানে গিয়া' এই শুনেই তাড়াতাড়ি বিলের টাকা বাবদ একটা একশো টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে তিন লাফে নীচে নেমে নিজের গাড়ীতে উঠবে।)

বারো নম্বর দৃশ্য

(টুটুল গাড়ী চালাচ্ছে···এমন সময় কিছুটা এগোলে ও' দেখতে পাবে —সাম্নে আর একটা প্রকাণ্ড গাড়ী ! গাড়িটি একটি মেয়ে চালাচ্ছে— তার স্কার্ফ হাওয়ায় উড়ছে, চুলগুলো উড়ছে···খুব জোরে গাড়ী চালিয়ে চলেছে সে। টুটুলও তাকে ধরবার জন্যে নেশার ঝোঁকে গাড়ীতে দারুণ স্পীড দেবে। তারপর সেই দুরন্ত স্পীডে চলমান গাড়ীতে ষ্টিয়ারিং-হাতে অবস্থায় আপন মনে বলবে)

টুটুল। ঐ ত দূরে দেখা যে যায়,
যেন, পিছু ফিরে ফিরে কাহারে চায়···
নিজেই চলছে ড্রাইভ করে !
—ধরতেই হবে
যে—কোন উপায়, বেঁচে কী মরে।

(গাড়ী দুটো তখন প্রায় পাশাপাশি হয়ে এসেছে। টুটুল মেয়েটির উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বল্লে)

নাম-না-জানা সুন্দরী মোর,
কোথায় পালিয়ে যাও···

মেয়েটি। তুমি মায়ামৃগ,
আমিও সোনার-হরিণী !
বন্ধনে তাইতো তোমায় ধরিনি।
— ফিরে যাও, ফিরে যাও।

টুটুল। তোমার গাড়ীর টায়ারের দাগে,
পিচের পথেতে গান যেন জাগে···
সে-সুর আমার খেলা করে সারা শরীর ময় !

মেয়েটি। 'নিশির ডাকে'র মতন যে-সুর
নিয়ে চলে কোন্ দূর হতে দূর···
কিসের সাহসে ভুলে গেছি যেন
সকল ভয় !



টুটুল। তব অদূর-অঙ্গ-আতর-গন্ধে

মায়ামৃগ

থর-থর-থর আকুল ছন্দে
উতলা আমার আত্মাময়…
দেবনা তোমায়—দেবনা যেতে—
দাঁড়াব আগুলি পথ !
—আমার প্রাণের পাঁজর পিষিয়া
চলে যাক তব রথ !

(টুটুল এবার জীবন বিপন্ন করে গাড়ী চালিয়ে মেয়েটির গাড়ির আগে এনে পথ আগলে সত্যি-সত্যিই রাখতে যাবে যেই নিজের গাড়িটা, ঠিক সেই সময় মেয়েটি চট করে ডাইনে বেঁকে বেরিয়ে যাবে তীরের মতন। আর টুটুলের গাড়ীটা সেই মুহূর্তে এসে লাগাবে ধাক্কা চৌমাথার কংক্রিটের ছাতাওয়ালা পুলিশের সেই পোষ্টটির গায়।)

অন্তঃ পৰ্ব্ব

(সেই ধাক্কায় স্বপ্ন-ভেঙে টুটুল বাস্তব লোকে ছিটকে এসে পড়লো—যাক, ও' মরেনি, এমন কি ও'র গাড়িটাও চুরমার হয় নি। ও' দেখে—ও' দিব্বি শুয়ে আছে বিছানায়—সমস্তটাই স্বপ্নের ঘটনা! কিন্তু সত্যি সত্যিই অনেক বেলা হয়ে গেছে তখন। ও' আলিস্যি ভেঙে জানালার ধারে রদ্দুরে এসে দাঁড়াবে।

হঠাৎ আগত জন-সমুদ্রের ভীষণ একটা কলরোলে টুটুল উৎসুক হয়ে ওঠে। দেখে, বিরাট মিছিল…জাতীয় পতাকা হাতে চলেছে অসংখ্য নরনারীর সর্পিল স্রোত। একি, একি, এযে ইলা! ইলাই যে দেখছি মিছিল পরিচালনা করছে। টুটুল আর থাকতে পারে, না, ড্রেসিং গাউনটা গা-থেকে খুলে বিছানার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর সেই ঢিলে-পায়জামা আর পাঞ্জাবী-পরা অবস্থাতেই উস্কো-খুস্কো চুল আর বাসি মুখ নিয়েই নিচে নেমে আসে—তারপর পেরিয়ে যায় লন। ওদের মিছিল তখন এসে গেছে ঠিক ও'র ফটকের গায় গায়। একি! এযে টুটুল ইলার পাশে এসে হাজির! তারপর দেখা যাবে ইলার দক্ষিণ করের মুঠির উপরে টুটুলেরও দক্ষিণ হাতের বজ্র মুষ্টিতে ধরা জাতীয় পতাকা…

পথের দৃশ্য

টুটুলের ঘুম টুটে গেছে, স্বপ্ন ছুটে গেছে

বাস্তব দিবালোকে ঝলমল করা দেখা যাবে—

কোলকাতা সহরের পথ



(গান)

জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্—
কৈলাস হ'তে কুমারিকা
আর বিন্ধ্য হইতে সিন্ধু,
মুক্ত করব আমরা ভারতবর্ষ !
মজতুর ও মুটে,
শৃঙ্খল টুটে···
তাদের মাঝেও জেগেছে নতুন হর্ষ।

কামার, কাঠুরে, হাল ধরে যারা চাষা—
তাদের মাঝারে জেগেছে নতুন আশা
জাগে কর্মীরা, যোদ্ধা, আহত—
কবিরা জেগেছে, শিল্পীরা যত—
নতুন জীবনে জেগেছে নতুন ভাষা !

জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্—
জাগে 'পাতিয়ালা' 'ভূপাল' 'নেপাল'
জাগে 'ঝালোয়ার' 'ঝিন্দ্' !
'স্বরাজের' বাণী পাবে আজ রূপ—
মুক্তি দেউলে রক্তের ধূপ
জ্বালো, জ্বালো, জ্বালো,
জ্বেলে দাও, জ্বেলে দাও—
শোণিত চাহিরে অর্ঘ্য হিসাবে
মুক্তিরে যদি চাও।

হিন্দুকুশের শিখরে আজকে
গিয়েছে কুয়াশা কেটে,
নতুন সূর্য তূর্য নিনাদে
জাগে হিমালয় ফেটে
মুক্তি-গঙ্গা নামে হেথা আজ
সৈনিক তোরা সাজ সাজ সাজ—
দেশের মুক্তি আনব আমরা
শক্তির বেয়নেটে।

জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্
কৈলাস হতে কুমারিকা
আর বিন্ধ হইতে সিন্ধু,...

